এ বছর (২০১১) সাতই জানুয়ারি কয়েকজন রবীন্দ্রপ্রেমী এক সভায় মিলিত হয়ে রবীন্দ্রনাথের সার্ধশতজন্মবার্ষিকী উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে এক শ একান্নটি বইয়ের একটি গ্রন্থমালা প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেন।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাধারণ মানুষের পরিচয় ঘটানো এবং তাঁর ও সাধারণ মানুষের মধ্যে দূরত্ব কমিয়ে আনা এ গ্রন্থমালার উদ্দেশ্য।

এ বইটি এ গ্রন্থমালার একটি বই।

রবীন্দ্রনাথের জন্মের দেড় শ বছরে এ গ্রন্থমালা তাঁর প্রতি আমাদের বিনীত ও সশ্রদ্ধ নিবেদন।

সম্পাদক

আমরা যতো দূর জানি : বাংলাদেশে এর আগে একসঙ্গে এক শ একান্নটি বই কখনো প্রকাশিত হয়নি ; বাংলা ভাষায় রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে এতোগুলো বই এর আগে একসঙ্গে কখনো বেরোয়নি ; এবং রবীন্দ্রনাথের বহু বিচিত্র দিক একসঙ্গে তুলে ধরে তাঁকে তাঁর সামগ্রিকতায় দেখার এমন উদ্যোগ এর আগে কখনো নেয়া হয়নি। বাচ্চাদের আঁকা ছবি দিয়ে একসঙ্গে এতগুলো বইয়ের প্রচ্ছদ এর আগে এ দেশে তৈরি করা হয়েছে বলেও আমাদের জানা নেই। আমরা কৃতার্থ।

প্রকাশক

9 789845 041614
ISBN 978-984-504-161-4

রবীন্দ্রনাথ ও ফরাশি সংস্কৃতি | মাহমুদ শাহ কোরেশী | মূর্ধন্য

রবীন্দ্রনাথ ও ফরাশি সংস্কৃতি

মাহমুদ শাহ কোরেশী

রবীন্দ্রনাথের করা ভিক্তর য়্যাগোর চারটি কবিতার অনুবাদ 'প্রভাতসংগীত'–এ জায়গা পায়। দারিয়ুস মিলো রবীন্দ্রনাথের একটি গানে সুর দেন। আঁদ্রে জিদ 'গীতাঞ্জলি' অনুবাদ করেন। পল ভ্যালেরি, স্যাঁ–জন পের্স, অঁরি বের্গসোঁ, সিলভ্যাঁ লেভি ও রম্যাঁ রলাঁ ছিলেন তাঁর গুণমুগ্ধ। রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলার প্রথম প্রদর্শনী হয় প্যারিসে। কোঁতেস আনা দ্য নোয়াই–এর মনে হয় রবীন্দ্রনাথের দুটি হাত 'সমস্ত মানবতাকে' সমৃদ্ধ করতে পারে।

ISBN 978-984-504-161-4

তোমার প্রতি চাহিয়া আমাদের বিস্ময়ের সীমা নাই

রবীন্দ্র-স্মারক গ্রন্থমালা

রবীন্দ্রনাথ ও ফরাশি সংস্কৃতি

মাহমুদ শাহ কোরেশী

মূর্ধন্য

'কবিগুরু, তোমার প্রতি চাহিয়া আমাদের বিস্ময়ের সীমা নাই'

– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সপ্ততম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে কলকাতার টাউন হলে ১১ই পৌষ, ১৩৩৮ / ২৭ ডিসেম্বর, ১৯৩১ তারিখে আয়োজিত সংবর্ধনা-সভায় শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা মানপত্রের প্রথম বাক্য। মানপত্রটি পড়েন কবি কামিনী রায়।

পুস্তানিতে ব্যবহৃত রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি : উইলিয়াম রদেনস্টাইন, ১৯১২।

Statement on the first page : *Looking at you, we never cease to wonder* : tribute paid to Rabindranath Tagore on his seventieth birth anniversary in 1931 by Saratchandra Chatterjee, an outstanding novelist. Poet Kamini Roy read out the tribute.

Opening portrait of Rabindranath Tagore : William Rothenstein, 1912.

রবীন্দ্র-স্মারক গ্রন্থমালা

উপদেষ্টা পরিষদের সভাপতি

জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরী

উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য

অধ্যাপক খান সারওয়ার মুরশিদ
বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান
অধ্যাপক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী
এমিরেটাস অধ্যাপক আনিসুজ্জামান

গ্রন্থমালা সম্পাদক

মনজুরে মওলা

সম্পাদনা সহযোগী

তারেক রেজা, তারিক মনজুর, এম. আব্দুল আলীম, তানভীর আহমদ, আহমদ মোস্তফা কামাল, হাসান হাফিজ, কাজল বন্দ্যোপাধ্যায়, আমিনুল ইসলাম ভুইয়া, সেলিনা হোসেন, ভূঁইয়া ইকবাল, সুব্রত বড়ুয়া, মালেকা বেগম, হায়াৎ সাইফ, সফিউদ্দিন আহমদ, আবু তাহের মজুমদার।

মূর্ধন্য

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সার্ধশতজন্মবার্ষিকী (২৫ বৈশাখ ১৪১৮, ৭ মে ২০১১) উপলক্ষে প্রকাশিত

রবীন্দ্র-স্মারক গ্রন্থমালা

প্রকাশক
সঞ্জয় মজুমদার
মূর্ধন্য
৪১ কনকর্ড এম্পোরিয়াম শপিং কমপ্লেক্স (বেইজমেন্ট)
২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫
ফোন : ০১১ ৯১১ ৯১১ ৪৩

প্রকাশকাল
ডিসেম্বর ২০১১

বর্ণবিন্যাস ও পৃষ্ঠাসজ্জা
মূর্ধন্য গ্রাফিক্স

গ্রন্থমালা মুদ্রণ
ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া গ্রুপ লি. ঢাকা

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
আবির অর্ণব

প্রচ্ছদ শিল্পী
খন্দকার মুন্তাসির শামস, বয়স দশ বছর

মূল্য
এক শত বিশ টাকা মাত্র

Rabindranath o Farashi Sangskriti (Tagore and the French Culture) by Mahmud Shah Qureshi

A volume in *Rabindra-Smarak Granthamala* (Tagore Memorial Books), a series of 151 books on Rabindranath Tagore (born 07 May 1861), brought out simultaneously on the occasion of his 150th birth anniversary.

General Editor : Munzur-i-Mowla

Published December 2011 by Sanjoy Majumdar, Murdhonno, 41 Concord Emporium Shopping Complex (Basement), 253/254 Elephant Road, Dhaka-1205, Bangladesh. Cell : +8801191191143, e-mail : info@murdhonno.com, Web : www.murdhonno.com.

Cover Design : Abir Arnob. Cover Artist : Khondaker Muntaseer Shams, age ten years

Price : Taka 120.00 US $ 5.00 only

ISBN 978-984-504-161-4

উৎসর্গ

A la mémoire d' André Malraux et de Louis Renou

অঁদ্রে মাল্‌রো - ফরাশি সংস্কৃতি মন্ত্রী, ১৯৬১ সালে ফ্রান্সে রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকী জাতীয় কমিটির প্রধান পৃষ্ঠপোষক এবং অধ্যাপক লুই রনু - সম্মানিত সদস্য ও কার্যকরী সমিতির সভাপতি - রবীন্দ্র-অনুরাগী দুই বিশ্ববরেণ্য মনীষী স্মরণে

গ্রন্থমালা বিষয়ে

এ বছর (২০১১) সাতই জানুয়ারি কয়েকজন রবীন্দ্রপ্রেমী এক সভায় মিলিত হয়ে রবীন্দ্রনাথের সার্ধশতজন্মবার্ষিকী উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে এক শ একান্নটি বইয়ের একটি গ্রন্থমালা প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেন।

রবীন্দ্রনাথের কাজের ক্ষেত্র এতো বিচিত্র, তাঁর সৃষ্টিশীলতা এতো বিশাল ও তাঁর ভাবনা এতো পরিশীলিত যে, সাধারণ মানুষের পক্ষে তাঁকে ঠিকমতো জানা ও তাঁর কাছাকাছি পৌঁছুনো সহজ নয়। অথচ, আজকের দিনের বাংলাভাষী প্রায় প্রত্যেক মানুষের জীবনেই রবীন্দ্রনাথ কোনও-না-কোনওভাবে তাঁর ছায়া ফেলে গেছেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাধারণ মানুষের পরিচয় ঘটানো এবং তাঁর ও সাধারণ মানুষের মধ্যে দূরত্ব কমিয়ে আনা এ গ্রন্থমালার উদ্দেশ্য।

এ উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথের জীবন, কাজ, অবদান ও চিন্তার ছোটো-ছোটো দিক নিয়ে যতোদূর সম্ভব সহজ করে লেখা অনেকগুলো বই একসঙ্গে পাঠকের হাতে তুলে দেয়ার পরিকল্পনা করা হয়। এর ফলে সাধারণ মানুষ, আশা করা যায়, রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আগের চাইতে বেশি আগ্রহী হয়ে উঠবেন, রবীন্দ্রনাথকে তাঁর তুলনাহীন বৈভবে আবিষ্কার করবেন, পুরোপুরি না হলেও তাঁকে অনেকখানি জানার সুযোগ পাবেন। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে যদি কোনও ভুল, বা, একপেশে, বা, ভিত্তিহীন ধারণা থেকে থাকে, তা-ও হয়তো দূর হবে। রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে নতুন গবেষণা, বা, বিশ্লেষণ এ গ্রন্থমালার উদ্দেশ্য নয়। তারপরও, এ সব বইয়ে যে-তথ্য ও রবীন্দ্রনাথের লেখার যে-ব্যাখ্যা দেয়া থাকবে, তা থেকে যদি গবেষক ও শিক্ষার্থীরা উপকৃত হন, তাহলে তা বিশেষ আনন্দের বিষয় হবে।

গ্রন্থমালার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করা হয়। জাতীয় অধ্যাপক ও বাংলা একাডেমীর সভাপতি কবীর চৌধুরী এ উপদেষ্টা পরিষদের সভাপতি। বিশিষ্ট অধ্যাপক, প্রাক্তন উপাচার্য ও কমনওয়েলথের প্রাক্তন অ্যাসিসটেন্ট সেক্রেটারি জেনারেল খান সারওয়ার মুরশিদ, বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি ও এক প্রাক্তন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান, বিশিষ্ট অধ্যাপক, প্রাক্তন উপাচার্য, কবি ও সমালোচক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের এমিরেটাস অধ্যাপক ও রবীন্দ্র-বিশেষজ্ঞ আনিসুজ্জামান উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য। উপদেষ্টা পরিষদের দায়িত্ব ছিলো : (১) নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ; (২) দিক-নির্দেশনা প্রদান ; ও (৩) গ্রন্থমালার সার্বিক তত্ত্বাবধান। উপদেষ্টা পরিষদের অনুমোদনক্রমে প্রতিটি বইয়ের লেখক ও বিষয় নির্বাচন করা হয়।

এ গ্রন্থমালা সম্পাদনার দায়িত্ব প্রদান করে উপদেষ্টা পরিষদ আমাকে সম্মানিত করেছে।

রবীন্দ্রনাথ অক্ষয় কীর্তি স্থাপন করেছেন ; খ্যাতি ও সম্মান পেয়েছেন ; দুঃখ, বেদনা, হতাশা ও ক্ষোভের মধ্য দিয়ে জীবন কাটিয়েছেন ; কবি, ঔপন্যাসিক, ছোটগল্পকার, প্রবন্ধকার, পত্রলেখক, নাট্যকার, নাট্যাভিনেতা, সঙ্গীতরচয়িতা ও চিত্রশিল্পী ছিলেন ; বাংলা ভাষায় প্রথম নৃত্যনাট্য রচনা করেছেন ; ভাষাকে নতুন করে তুলেছেন ; রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও মানবাধিকার কর্মী ছিলেন ; শিক্ষক ছিলেন ; অসাম্য ও অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছেন ; দার্শনিক ছিলেন, ধর্ম নিয়ে ভেবেছেন ; মানুষকে বড়ো করে তুলেছেন, মানুষ হিসেবে সম্মান দেখিয়েছেন ; প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে যোগ তৈরি করতে চেয়েছেন – এতো অর্জনের পরেও এবং এর সবই ছাড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ, আমাদের বিশ্বাস, শেষ পর্যন্ত সাধারণ মানুষের কাছেই পৌঁছুতে চেয়েছিলেন।

সাধারণ মানুষের মধ্যে শিশুরা, আমরা মনে করি, সব চাইতে মূল্যবান। রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবি দেখে চিত্রসমালোচক আনন্দ কুমারস্বামীর মনে হয়েছিল, তিনি যেন শিশুর চোখে পৃথিবীকে দেখছেন (ভূমিকা, 'রবীন্দ্রনাথ টেগোর', অক্টোবর, ১৯৩০)। এ গ্রন্থমালার প্রতিটি বইয়ের প্রচ্ছদে ব্যবহৃত রবীন্দ্রনাথের ছবি কোনও-না-কোনও শিশুর আঁকা। আজকের শিশুদের চোখে রবীন্দ্রনাথ কেমন, ছবিগুলো তা-ই তুলে ধরে। যখন রবীন্দ্রনাথের দ্বিশতজন্মবার্ষিকী পালিত হবে, তখন এখনকার এই শিশুরা তাদের সন্তান-সন্ততিদের গৌরবের সঙ্গে বলতে পারবে, রবীন্দ্রনাথের জন্মের দেড় শ বছর উদ্‌যাপনের সময় তারাও আনন্দময় অবদান রেখেছিল।

এ গ্রন্থমালার বই যদি, উদাহরণত, আবু সয়ীদ আইয়ুবের সমালোচনার মতো, কিংবা, প্রশান্তকুমার পালের গবেষণার মতো উঁচু মানের হতো, তাহলে তা খুবই আনন্দের বিষয় হতো। কিন্তু তেমনটি হলে একটি অসুবিধে দেখা দিতো : এ বইগুলো আর সাধারণ পাঠকের জন্য লেখা বই থাকতো না। উপদেষ্টা পরিষদ প্রতিটি লেখার গুণগত মান যেমন নিশ্চিত করতে চেয়েছে, এ গ্রন্থমালার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যও তেমনি অর্জন করতে চেয়েছে, এবং দুটো একই সঙ্গে চেয়েছে। এই যে প্রায় দেড় শ'র মতো লেখক এ গ্রন্থমালার জন্য লিখতে আনন্দের সঙ্গে সম্মত হয়েছেন, এ দেশে রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে লেখাকে ভবিষ্যতে তা আরও ব্যাপক ও আরও উজ্জ্বল করে তুলবে, এমন আশা তো নিশ্চয়ই করা যায়।

সব চেষ্টা সত্ত্বেও এ সব বইয়ে, সন্দেহ হয়, কিছু ভুল থেকেই গেছে। এ সব ভুল যে সব সময় ছাপার ভুল, এমনটি না-ও হতে পারে। [এক বইয়ে লেখা হয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ 'কবি-কাহিনী' লেখেন ১২৮৬ খ্রিষ্টাব্দে – তার মানে, জন্মের প্রায় ছ শ বছর আগে।] যদি কোনও ভুল থেকে থাকে, তাহলে আমি লজ্জিত ও দুঃখিত।

বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়েছিল বৈরী পরিবেশে। আজ, স্বাধীন, সার্বভৌম বাংলাদেশে, ২০১১ সালে, তাঁর সার্ধশতজন্মবার্ষিকী আমরা গৌরবের সঙ্গে পালন করছি।

রবীন্দ্রনাথের জন্মের দেড় শ বছরে এ গ্রন্থমালা তাঁর প্রতি আমাদের বিনীত ও সশ্রদ্ধ নিবেদন।

এই বই

রবীন্দ্রনাথের করা ভিক্তর য়্যাগোর চারটি কবিতার অনুবাদ 'প্রভাতসংগীত'–এ জায়গা পায়। দারিয়ুস মিলো রবীন্দ্রনাথের একটি গানে সুর দেন। আঁদ্রে জিদ 'গীতাঞ্জলি' অনুবাদ করেন। পল ভ্যালেরি, স্যাঁ–জন পের্স, অঁরি বের্গসোঁ, সিলভ্যাঁ লেভি ও রম্যাঁ রলাঁ ছিলেন তাঁর গুণমুগ্ধ। রবীন্দ্রনাথের চিত্রকলার প্রথম প্রদর্শনী হয় প্যারিসে। কোঁতেস আনা দ্য নোয়াই–এর মনে হয় রবীন্দ্রনাথের দুটি হাত 'সমস্ত মানবতাকে' সমৃদ্ধ করতে পারে।

এ বইয়ে যে–মতামত তুলে ধরা হয়েছে, তা সম্পূর্ণত লেখকের, উপদেষ্টা পরিষদের বা সম্পাদকের নয়।

কৃতজ্ঞতা

এই গ্রন্থমালার লেখকদের কাছে আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। এই লেখকরা বাংলাদেশের নানা জায়গায় ছড়িয়ে–ছিটিয়ে আছেন ; বহুদূর দেশ থেকেও কেউ–কেউ লেখা পাঠিয়েছেন। খুব অল্প সময়ের মধ্যে তাঁরা বই লিখে দিয়েছেন ; ছবি নির্বাচন করে দিয়েছেন এবং ছবি কোন পৃষ্ঠার কোথায় বসবে, তা দেখিয়ে দিয়েছেন ; পাণ্ডুলিপি চূড়ান্ত আকারে দেখে দিয়েছেন। তাঁদের সহযোগিতা ছাড়া এ গ্রন্থমালা প্রকাশ করা কিছুতেই সম্ভবপর হতো না।

এ গ্রন্থমালার একজন লেখক আমাকে একদিন বলেন যে, তাঁর ধারণা এ গ্রন্থমালার জন্য আমরা বাংলাদেশ সরকার ও একটি বিদেশি সরকারের কাছ থেকে প্রভূত পরিমাণ অনুদান পেয়েছি। না, পাইনি। আমরা কারও কাছে কোনও অনুদানের জন্য, বা, অর্থ–সাহায্যের জন্য হাত পাতিনি, কোনও বিদেশি সরকারের কাছে তো নয়ই, বাংলাদেশ সরকারের কাছেও নয়। আমরা এ গ্রন্থমালাকে কোনও পণ্যের বিজ্ঞাপন হিসেবেও ব্যবহার করতে দিইনি। তবে, হ্যাঁ, এ গ্রন্থমালার বই কেনার জন্য উপদেষ্টা পরিষদের সভাপতি বহু প্রতিষ্ঠানকে অনুরোধ করেছেন। কোনও-কোনও প্রতিষ্ঠান তা রক্ষা করেছে, কোনও–কোনও প্রতিষ্ঠান রক্ষা করেনি। বই বিক্রির টাকা থেকেই এ গ্রন্থমালার বই প্রকাশ করা হয়েছে। যে–সব প্রতিষ্ঠান প্রকাশের আগেই এ গ্রন্থমালার বই কিনেছে, তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ব্র্যাক, গ্রীন ডেল্টা ইনসুরেন্স কোম্পানি, অগ্রণী ব্যাংক ও জনতা ব্যাংক। তুলনামূলকভাবে কম সংখ্যায় হলেও আরও কিছু–কিছু প্রতিষ্ঠান এ গ্রন্থমালার বই অগ্রিম কিনেছে। এদের সবার কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। কৃতজ্ঞ শান্ত–মরিয়ম ফাউন্ডেশনের কাছে – এ প্রতিষ্ঠানের শিশু–শিল্পীরা এ গ্রন্থমালার বইয়ের প্রচ্ছদ এঁকে দিয়েছে। কৃতজ্ঞ ঢাকা ক্লাবের কাছে – উপদেষ্টা পরিষদের সভা অনুষ্ঠানের জন্য ক্লাব আমাদের জায়গা দিয়েছে ; ক্লাবের সভাপতি ২৫/০৩/২০১১ তারিখে উপদেষ্টা পরিষদের সভাপতি ও গ্রন্থমালার লেখকদের সম্মানে এক চা–চক্র আয়োজন করেন।

এ গ্রন্থমালার কিছু–কিছু বই পরীক্ষামূলকভাবে প্রথমে মাত্র কয়েক কপি ছাপা হয়েছিল। প্রফেসর আনিসুজ্জামান সেগুলো অনুগ্রহপূর্বক দেখে দিয়েছেন। তাঁর দেখানো পথ আমরা অন্য বইয়ে অনুসরণ করার চেষ্টা করেছি। প্রফেসর আনিসুজ্জামানকে গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই।

উপদেষ্টা পরিষদের কাছেও আমাদের কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। পরিষদ সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত দিয়ে আমাদের পথ দেখিয়েছে। আমরা বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ পরিষদের সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর কাছে। পরিষদের সভার বাইরেও তিনি প্রায় প্রতিদিন আমাদের সময় দিয়েছেন, নির্দেশনা দিয়েছেন, বিভিন্ন জায়গায় যোগাযোগ করেছেন, সঙ্কটের মুহূর্তে উৎসাহিত করেছেন। প্রায় নব্বই বছরের কাছাকাছি পৌঁছেও তিনি ছিলেন আমাদের মধ্যে সব চাইতে তরুণ।

এই তরুণ ১৩ ডিসেম্বর (২০১১) ভোরবেলা হঠাৎ করে চলে গেলেন। এ গ্রন্থমালায় তাঁর লেখা বইয়ের প্রচ্ছদ দেখে গিয়েছিলেন, লেখার মুদ্রণাদেশ দিয়ে গিয়েছিলেন – বই ছাপা হবার ঠিক আগে–আগে তাঁর জীবন ফুরিয়ে গেলো। মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা আগেও তাঁর মেয়েকে এ গ্রন্থমালা বিষয়ে তাঁর স্বপ্নের কথা বলেছেন। উপদেষ্টা পরিষদের তেইশে সেপ্টেম্বরের সভায় বলেছিলেন, শেষ বয়সে এসে এ গ্রন্থমালা প্রকাশের মতো একটি কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে পেরে তিনি নিজেকে বিশেষভাবে সম্মানিত ও ধন্য জ্ঞান করেন।

সম্পাদনা সহযোগীরা আমার কঠিন কাজ অনেক সহজ করে দিয়েছেন। তাঁদেরকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

প্রকাশক ও তাঁর সহযোগীরা দিন নেই রাত নেই কাজ করেছেন। তাঁদের পরিশ্রম ও উৎসাহ আমার জন্য অমূল্য সম্পদ ছিলো।

আমার সবশেষ কৃতজ্ঞতা, আগে থেকেই, পাঠকের কাছে। পাঠক ছাড়া বই হয় না। আশা করি, পাঠকের আনুকূল্য আমরা পাবো।

মনজুরে মওলা

২৩ ডিসেম্বর ২০১১

ফরাশি উচ্চারণ রীতি

এই গ্রন্থে একই শব্দের একাধিক বানান পরিলক্ষিত হবে। কারণ হলো, আমরা প্রত্যেক লেখকের নিজস্ব বানান অবিকল রাখতে চেয়েছি। তবে ফরাশি যে উচ্চারণ আমাদের দীর্ঘ অধ্যয়ন-সূত্রে আয়ত্তে এসেছে কিংবা বিখ্যাত ধ্বনি-বিজ্ঞানীদের কাছে যা শেখা হয়েছে তাই বাংলা লিপিতে অনুসরণের প্রয়াস পেয়েছি। কয়েকটি উদাহরণ দিই : তবে প্রথমত ফ্রেঞ্চ / French এর তর্জমা আমরা 'ফরাশি' লিখতে ইচ্ছুক যদিও রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে অনেকে 'ফরাসি' বা 'ফরাসী' লিখেছেন। আমাদের স্বপক্ষে আছেন বুদ্ধদেব বসু এবং আরো ক'জন ফরাশি-অভিজ্ঞ আধুনিক লেখক ও শিক্ষক। স্থান-নামের ক্ষেত্রে Paris কে 'প্যারিস' (ইংরেজির অনুকরণে এবং আন্তর্জাতিকভাবে উচ্চারিত বলে) অথবা প্যারি / প্যারি বানানেও উদ্ধৃত। কিন্তু Marseilles, Versilles 'মার্সেই', 'ভের্সাই' হবে। অন্যকিছু নয়। তবে ফরাশি 'র' আর বাংলার 'র' এক নয় এটা স্মরণ রাখতে হবে। তাছাড়া 'অঁ', 'আঁ'-এর একটা সমস্যা থেকেই যাচ্ছে। ঈষৎ–দীর্ঘ 'অ' উচ্চারণে আমরা France, Anglais / 'ফ্রঁস', 'অঁগ্‌লে' বলবো বা লিখবো তবে স্বদেশী অনেকেই তা করেন না, এমনকি দুচারজন ফরাশি বিদ্বজনও করেন না। কিছু করার নেই, কে কাকে কত শুদ্ধ করে দেবে ! এভাবে 'আঁদ্রে জীদ' লিখবো না 'অঁদ্রে জিদ্' এটা এক সমস্যা। আমরা শেষোক্তটা পছন্দ করলাম। তবে অন্যের উদ্ধৃতি অবিকৃত রাখতে সচেষ্ট থেকেছি।

ঠাকুরবাড়ির ফরাশি যোগ

দ্বারকানাথ ঠাকুর প্যারিসে গেলে (১৮৪৪) সম্রাট লুই ফিলিপ তাঁকে যথোপযুক্ত সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। দ্বারকানাথ স্বয়ং একটি নৈশভোজের আয়োজন করেন যাতে সম্রাট ও অন্যান্য বিশিষ্ট ফরাশিরা অংশগ্রহণ করেন। কথিত আছে, তিনি ফরাশি মহিলাদের প্রত্যেককে একটি করে কাশ্মিরী শাল উপহার দেন।

'রূপে, গুণে, দানে, দাক্ষিণ্যে' অনন্য ফরাশিরা তাঁকে যথার্থ 'প্রিন্স' বলে গ্রহণ করেন। প্যারিসের অভিজাত সালোঁসমূহে (salons) তাঁকে নিয়ে 'কাড়াকাড়ি' পড়ে যায়। সেখানে অন্ধদের স্কুল দেখে তিনি মুগ্ধ হন এবং কলকাতায় একই রকম স্কুল প্রতিষ্ঠার সংকল্প নেন। দুর্ভাগ্যবশত ইংল্যান্ডে তাঁর অকাল মৃত্যু ঘটে। প্যারিসে দ্বারকানাথের সাথে ফরাশি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ফেলিক্স সেবাস্তিয়্যাঁ দ্য কোঁশ-এর গভীর বন্ধুত্ব হয়। দ্য কোঁশ 'এক অশীতিপরের দিনলিপি' নামে একটি স্মৃতিকথা প্রকাশ করেন ১৮৮২ সালে। বইটির 'কয়েকজন ভারতীয়ের আগমন' শীর্ষক ১৫তম অধ্যায়ে দ্বারকানাথ সম্পর্কে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। দ্য কোঁশ ও দ্বারকানাথ এক সঙ্গে বসে ছবি আঁকিয়েছিলেন বলেও জানা যায়।

দ্বারকানাথের পুত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর আরবী-ফার্সি কাব্য ও দর্শন চর্চায় অগ্রণী ছিলেন, এটা বহুজ্ঞাত । কিন্তু 'ফরাসী দার্শনিকদের গ্রন্থে মহর্ষির অনুরাগ ছিল', এটা এক নতুন তথ্য । ('দেশ', ১৬ জুলাই, ১৯৫৫)।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিকথার সূত্রে জানা যায় যে, দেবেন্দ্রনাথ ফরাশি দার্শনিক ভিক্তর কুজ্যাঁ-র (Victor Cousin) 'সত্য-সুন্দর-মঙ্গল' (Le vrai, le beau, le bien) গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ পাঠ করে এত মুগ্ধ ছিলেন যে, তার মূল টেক্সট আনিয়ে

ইংরেজি-ফরাশি অভিধানের সঙ্গে মিলিয়ে একা নদী বক্ষে বোটে বসে পাঠ করেছিলেন। এ-এক দুরূহ গবেষণা বটে! তারপর কোথাও কোনো বিষয় যথার্থভাবে অনুধাবন করতে না পারলে জ্যোতিকে ডেকে তার 'অর্থ ব্যাখ্যা' করতে বলতেন। তিনি জানতেন জ্যোতি 'অল্পস্বল্প' ফরাশি জানেন। এদিকে জ্যোতি পিতার এই অধ্যবসায় দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন। অনেক পরে বোলপুরের গ্রন্থাগার থেকে 'কীটদষ্ট' ঐ গ্রন্থ আনিয়ে তিনি বাংলা অনুবাদ-কর্মে প্রবৃত্ত হন।

রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় জ্যেষ্ঠভ্রাতা সত্যেন্দ্রনাথ (১৮৪২-১৯২৩) এবং তাঁর বন্ধু মনোমোহন ঘোষ জ্যোতিকে ফরাশি ভাষার প্রাথমিক শিক্ষা দেন। তিনি ঠিক করলেন বোম্বাইতে চাকুরিতে যোগদানের সময় তাঁর চতুর্দশবর্ষীয়া স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন। একজন ফ্রেঞ্চ মহিলাকে দিয়ে তাঁর 'বর্হিগমনের উপযোগী' পোশাক তৈরি করাতে হয়েছিল। বড় বোন স্বর্ণকুমারী দেবীর লেখার সূত্রে আমরা এ তথ্য অবগত হই। বহু পরে এই বৌদি জ্ঞানদানন্দিনী দেবী ফ্রান্সের নীস শহরে বাস করবার সময় ওলেনদর্ফ (Ollendorf)-এর বই অনুসরণ করে ফরাশি কথাবার্তা চালাতে শিখেছিলেন। তাঁদের একমাত্র কন্যা ইন্দিরা দেবী (১৮৭৩-১৯৬০) ও তাঁর স্বামী স্বনামধন্য প্রমথ চৌধুরী আজীবন ফরাশি সাহিত্য-সংস্কৃতির অধ্যয়ন ও পরিবেশনায় সচেষ্ট থেকেছিলেন।

তৃতীয় জ্যেষ্ঠভ্রাতা হেমেন্দ্রনাথ (১৮৪৪-১৮৮৪) বাড়িতে শিক্ষক রেখে ফরাশি ভাষায় বিশেষ পারদর্শী হয়ে ওঠেন। ১৮৭০-এর দিকে হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বাড়িতে এক ফরাশি যুবককে পাচক রূপে নিয়োগ করেন। মাইনে ত্রিশ টাকা। শর্ত হচ্ছে তাঁকে রান্না ছাড়া ফরাশি ভাষাও শিক্ষা দিতে হবে। কাথর‍্যাঁ (Cathrin) নামক এই ফরাশি সৈনিকের ছিল অনেক গুণপনা। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ তাঁর সম্পর্কে

লিখেছেন। একবার তাঁর প্রস্তুত ডিনারে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে আপ্যায়িত করা হয়েছিল।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ১৮৬৭-৬৮ সালের কিছু সময় বড় ভাই সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে আমেদাবাদে কাটান। সেখানে তিনি ফরাশি ভাষা, চিত্রাঙ্কন ও সেতারবাদন শিক্ষা করেন। পরবর্তীকালে তিনি গল্প, উপন্যাস, কবিতা, নাটক, গান, প্রাচ্যতত্ত্ব বিষয়ক বহু রচনা ফরাশি থেকে অনুবাদ করেন, কখনও বা অনুসরণ করে নতুন রচনা তৈরি করেন। তাঁর অনূদিত কয়েকটি বিখ্যাত রচনা হলো : ফরাশি জাতীয় সংগীত, মলিয়ের-এর ল্য বুর্জোয়া জঁতিয়ম (Molière, 'Le Bourgeois Gentillehomme', 'হঠাৎ নবাব'), 'দায়ে পড়ে দার পরিগ্রহ' ('Mariage forcé'), তেয়োফিল গোতিয়ে-র (Théophile Gautier) দুটি উপন্যাস 'অবতার' ও 'মিলিতনা'। সম্ভবত সেগুলো তখনও ইংরেজিতেও অনূদিত হয় নি। তাছাড়া রয়েছে এমিল সেনার (Emile Sénart), পল লাপি (Paul Lapie), পিয়ের লোতি (Pierre Loti) প্রমুখের অনেক রচনা।

বিশ শতকে বিশের দশকে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক প্রেরিত হয়ে কালিদাস নাগ সর্বন থেকে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করেন। ফরাশি কবি পিয়ের জঁ জুভ-এর সহযোগিতায় তিনি 'বলাকা' (Cygne) অনুবাদ করেন। তাঁর আরেকটি কৃতিত্ব হচ্ছে বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারটির জন্য ফরাশি গ্রন্থ সংগ্রহের বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ।

রবীন্দ্রনাথের ফরাশি পাঠ: অন্যদের উৎসাহ প্রদান

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বাড়িতে গিয়ে, কলকাতার বাইরে কিংবা শিলাইদহে অবস্থান কালে, এমনকি বিলাতেও রবীন্দ্রনাথ ফরাশি চর্চা শুরু করেন বলে জানা যায়। কিন্তু তার মেয়াদ ছিল খুবই স্বল্পকালীন।

বিলাতে একটু ধৈর্য সহকারে ল্যাটিন অধ্যয়ন করলে সম্ভবত পরবর্তী কালে ফরাশি ভাষা আয়ত্তে আনা তাঁর পক্ষে সহজতর হত। কিন্তু তিনি নিজেই লিখেছেন, 'ল্যাটিন শেখার ক্লাসে আমি ছিলুম বোবা আর কালা। সকল রকম একসেরসাইজ খাতাই ছিল বিধবার থান কাপড়ের মত সাদা' ('ছেলেবেলা')। তবে তর্জমার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ এন্তার ফরাশি গল্প-উপন্যাস, কবিতা ও প্রবন্ধ পাঠ করেছেন। ছেলেবেলায় 'অবোধ বন্ধু' শীর্ষক পত্রিকা পেলেন যাতে বের্নাদ্যাঁ দ্য স্যাঁ-পিয়ের (Bernadin de Saint-Pierre)-এর ফরাশি উপন্যাস 'পল ও ভির্জিনি'-র তর্জমা ধারাবাহিক প্রকাশিত হচ্ছিল। রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, 'প্রশান্ত মহাসাগরের এক দ্বীপে দুই তরুণ তরুণীর জীবনের করুণ কাহিনী পড়তে পড়তে বালকের মন বেদনায় ভরে ওঠে। এই কাহিনীর প্রাকৃতিক বর্ণনার প্রভাব তাঁর বাল্য রচনা 'বনফুল'-এর মধ্যে বেশ স্পষ্ট।'

রবীন্দ্রনাথ নিজেও পরে উল্লেখ করেছেন, 'ছেলেবেলায় রবিনসন ক্রুসো, পোল ভর্জিনি প্রভৃতি বইয়ের গাছপালা, সমুদ্রের ছবি দেখে মন ভারী উদাসীন হয়ে যেত।' ('ছিন্নপত্র')

রবীন্দ্রনাথের লেখা আরেকটি পত্রের সূত্রে আমরা জানতে পারি যে, তাঁর মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথের থেওফিল গোতিয়ে (Théophile Gautier, 1811-1872) রচিত উপন্যাস 'মাদমোয়াজেল দ্য মোপ্যাঁ' (Mademoiselle de Maupin, 1835) 'খুবই ভালো' লেগেছিল।

রবীন্দ্রনাথ 'স্যাকসন জাতি ও অ্যাংলো স্যাকসন সাহিত্য' প্রবন্ধ লিখেছিলেন 'ভারতী'-র শ্রাবণ সংখ্যায়, (১২৮৫ বঙ্গাব্দ)। এতে তিনি অন্যদের মধ্যে ফরাশি ইতিহাসবিদ তেন-এর (H.T.Taine) কাছ থেকে সার-সংগ্রহ করেছেন বলে উল্লেখ করেছেন।

প্রথমে ভিক্তর য়্যাগো (Victor Hugo)-র চারটি কবিতা অনুবাদ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ, খুব সম্ভবত চন্দননগর অবস্থানকালে। কবিতা চারটির প্রথম পঙ্‌ক্তি : 'ঐ যেতেছেন কবি কাননের পথ দিয়া'; 'যে তোরে বাসে রে ভালো, তারে ভাল বেসে বাছা'; 'কাল সন্ধ্যাকালে ধীরে সন্ধ্যার বাতাস' ও 'বিপুল মহিমা-মূর্তি মহিয়সী মহিমার আগ্নেয় কুসুম'।

এগুলো 'প্রভাতসংগীত'-এ সংকলিত হয়।

দু' খণ্ডে রচিত য়্যাগোর 'লে কোঁতঁপ্লাসিঁয়ো' ('Les contemplations') কাব্য-গ্রন্থে এই কবিতা চারটি রয়েছে। প্রিয়নাথ সেন 'গীদে মোপাসঁ' প্রবন্ধে লিখেছেন "...বঙ্গের সর্বশ্রেষ্ট গীতিকবি আশ্চর্য প্রতিভা বলে, অসাধারণ নৈপুণ্যের সহিত ফ্রান্সের সর্বশ্রেষ্ট গীতিকবির কয়েকটি কবিতার চমৎকার অনুবাদ করিয়াছেন। তাহাতে ছন্দের সুষমা, ভাষার মাধুর্য এবং পদের মাহাত্ম্য সকলই রক্ষিত হইয়াছে। কোনটি অনুবাদ, কোনটি মূল, তুমি বলিতে পারিবে না। যেন দুইখানি সমুজ্জ্বল মুকুরে একই সুন্দর মূর্তি প্রতিফলিত হইয়াছে।"

'কড়ি ও কোমল' গ্রন্থে একটি কবিতার অনুবাদ রয়েছে। তাছাড়া তাঁর 'জীবন মরণ' শীর্ষক আরও একটা অনুবাদ কবিতা রয়েছে য়্যাগো থেকে "Ceux-ci partent, ceux la demeurent" 'ওরা যায়, এরা করে বাস'। তাছাড়া রয়েছে 'শিশুর মৃত্যু' কবিতাটি ('বেঁচে ছিল হেসে হেসে/ খেলা করে বেড়াত সে')। উপর্যুক্ত ৬টি কবিতা ছাড়াও ফরাশি-

চর্চার দৃষ্টান্তস্বরূপ রবীন্দ্রনাথের একটি রচনা পাওয়া যাচ্ছে মলিয়ের (Molière) সম্পর্কে।

রবীন্দ্রনাথ মূলে না হোক বাংলা বা ইংরেজি অনুবাদে কী কী ফরাশি গ্রন্থ পাঠ করেছিলেন, তা নিশ্চিত হওয়া বেশ দুরূহ। তাছাড়া প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত না হলেও মোপাসঁ-র (Maupassant) বহু মনোমুগ্ধকর গল্প তিনি পড়ে থাকবেন। তিনি নাকি একবার মন্তব্য করেছিলেন, 'ইংরেজ না এলে এদেশে আমরা সবাই মোপাসাঁ বনে যেতুম।' তাছাড়া ফরাশি কথাসাহিত্যে বেশ কিছু ক্লাসিক রচনা সম্পর্কে তাঁর ধারণা সুস্পষ্ট বলে মনে হয়।

১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯০০ সালে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'একটা ফরাসী ব্যাকরণ নিয়ে পাতা উল্টাচ্ছিলাম।' ৯ অক্টোবর, বন্ধু প্রিয়নাথকে লিখেছিলেন, 'ব্যাকরণ ঘেঁটে ফরাসী শেখা আমার কর্ম্ম নয়– আমার লাইব্রেরীতে যে যে ফরাসী গ্রন্থের তর্জ্জমা আছে তারই কোন একটার original পেলে সুবিধা হয়।' তালিকাটা নিম্নরূপ : Gautier-এর 'Capitane Fiacase'; Daudet-এর 'Jack'; Maupassant-এর 'Pierre & Jean'; ও 'No Relation'; Goncourt-এর 'Sister Philomene' ইত্যাদি।

তালিকাদৃষ্টে মনে হয় আরো কয়েকটি শিরোনাম ছিল। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, 'কয়দিন পূর্বে Anatole France- 'Le crime de Sylvestre Bonard' ফরাসি মূলের সন্ধান করেছিলেন। আমরা জানি 'No relation' ('Sans familli') এবং 'Crime of S. Bonard' কবির বিশেষ প্রিয় ছিল। 'Crime' বইটা এককালে কবি পড়িয়া শোনান; 'No Relation' তেজেশচন্দ্র সেন 'কুড়ানো ছেলে' নামে অনুবাদ করেন। নরেন্দ্রনাথ আইচ সন্ধ্যার বিনোদনপর্বে এই গল্পটি খুব রঙাইয়ে ছেলেদের বলিতেন।'

শান্তিনিকেতনে ফরাশি ভাষার অধ্যয়ন কবে থেকে শুরু হলো তা আমাদের জানা নেই। সম্ভবত মুম্বাই থেকে হিরজিভাই রোস্তামজী মরিস এসে তা শুরু করেছিলেন। এক পর্যায়ে ফরাশি লেখক পল রিশা আসেন (১৯২০-২১) – রবীন্দ্রনাথ তখন বিদেশে। তিনি ফরাশি পড়াতে শুরু করেন। কিছুপর তাঁর স্ত্রী মিলা এসে পাঁচ সপ্তাহ আশ্রমে থাকেন এবং প্রত্যহ ফরাশি পড়াতেন। তিনি যতদিন শান্তিনিকেতনে ছিলেন, ততদিন মরিস তাঁর কাছ থেকে ফরাশি ভাষায় কথোপকথনের পাঠ গ্রহণ করতেন। এরপর এন্ড্রুজ-এর প্রাক্তন ছাত্র নাসিরুল্লাহ দিল্লী থেকে এলেন। তিনি উর্দু এবং তাঁর ফরাশি স্ত্রী ফরাশি ভাষা ও সাহিত্য পড়ান। এর কিছু পর বিশ্বভারতীর ভিজিটিং প্রফেসর রূপে এলেন সিলভ্যাঁ লেভি। তাঁর স্ত্রী মাদাম দেজিরে লেভি খুবই নিষ্ঠার সঙ্গে ফরাশি ভাষার পাঠদান করেন।

ফরাশি অনেক অনুবাদ গ্রন্থ ভাল লাগলে রবীন্দ্রনাথ অন্যদের পড়তে অনুরোধ করতেন। গিজো (Guizot: 'Histoire de la civilisation en Europe', 'ইউরোপে সভ্যতার ইতিহাস' (১৮২৮) তার দৃষ্টান্ত। তাছাড়া রনে গ্রুসে-র প্রামাণিক বলে স্বীকৃত 'দূরপ্রাচ্যের ইতিবৃত্ত' (René Grousset: 'L'histoire de l'Extrême Orient') গ্রন্থের ভারতবর্ষ অংশ অনুবাদের জন্য তিনি ইন্দিরা দেবীকে নিয়োজিত করেন। পরে তার কিছুটা স্বকৃত সংক্ষেপিত রূপ মাসিক 'পরিচয়' পত্রের নবম বর্ষে প্রকাশের ব্যবস্থা করেন।

রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে এর্নেস্ত রনঁ-র 'জাতি কী' (Ernest Renan; 'What is a Nation') পড়েন। এর অনুসরণে লেখা তাঁর একটি প্রবন্ধ রয়েছে।

ফরাশি-সুইস দার্শনিক অঁরি ফ্রেদেরিক আমিয়েল-এর 'জুর্নাল' এক সময় খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ

বইটি গভীর মনোযোগের সঙ্গে পড়েছেন। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বন্ধু লোকেন পালিতের কাছ থেকে ধার করে এনে (ফেব্রুয়ারি ১৮৯৪) বইটি পড়েছেন এবং লিখছেন, 'যখনই সময় পাই সেই বইটা উল্টে পাল্টে দেখি। ঠিক মনে হয় তার সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে কথা কচ্চি – এমন অন্তরঙ্গ বন্ধু আর খুব অল্প ছাপার বইয়ে পেয়েচি।'

১৯২২ সালে লেভি ও তাঁর স্ত্রীর আগমনের পর শান্তিনিকেতনে ফরাশি ভাষা ও সাহিত্যচর্চার বেশ ভাল পরিবেশ গড়ে উঠেছিল। হিরজি ভাইয়ের উৎসাহে বিখ্যাত ফরাশি নাট্যকার মলিয়ের-এর ত্রিশত জন্মবার্ষিকী উদযাপিত হল মহাসমারোহে (১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯২২)।

শেষবার রবীন্দ্রনাথ যখন প্যারিসে যান সম্ভবত তখন জিদ তাঁর 'La porte étroite'- এর ইংরেজি অনুবাদ তাঁকে উপহার দেন। কবি বইটি পড়ে জিদকে যে জবাব দেন, সেটি ফরাশি সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গতার দুর্লভ দৃষ্টান্ত। তারিখবিহীন পত্রটিতে রবীন্দ্রনাথ লেখেন,

প্রিয় মি. জীদ

আপনার বই সরু দরজা-র জন্য আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

বইটি আমার মনের উপর প্রবল অভিঘাত সৃষ্টি করেছে– এর স্বচ্ছ সারল্য একটি সুকুমার সত্যকে খুব গভীর থেকে প্রকাশ করেছে। সাহিত্যে এই ব্যাপারটা করে তোলাই সবচেয়ে কঠিন। আপনি এই গল্পে যে আবহাওয়া তৈরি করেছেন আপনার উপন্যাসে তার সঙ্গে আমি একক অন্তরঙ্গ পরিচয় অনুভব করছি। আশা করি আমি ইউরোপ ছাড়ার আগে আরো একবার আপনার সঙ্গে সাক্ষাত হবে।

আপনার প্রশংসায় মুখর
রবীন্দ্রনাথ টেগোর

(সমীর সেনগুপ্ত, 'রবীন্দ্রসূত্রে বিদেশীরা')

স্থান-কাল-পাত্রের অভিজ্ঞতা

রবীন্দ্রনাথ প্রথম তিনবার বিলাত যাবার পথে প্যারিসে একটি রাত এবং দিনের কিছু সময় কাটিয়ে গেছেন। সৌভাগ্যবশত সে অভিজ্ঞতার কিছু বর্ণনা তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন।

ট্রেন ভ্রমণে গিয়ে স্বল্পস্থায়ী প্যারিস অবস্থানে পরিবেশ বা ভিন্ন দেশের মানুষের সামান্য অভিজ্ঞতাও রবীন্দ্রনাথের পর্যবেক্ষণ ও বর্ণনাগুণে কখনো কখনো অসামান্য হয়ে উঠেছে। পরবর্তীকালে তিনি ফ্রান্সে তথা প্যারিসের আশে পাশের শহরে আরো দীর্ঘ সময়ের জন্য থেকেছেন। কিন্তু সে সম্পর্কে বিস্তৃত কিছু জানান নি। শুধু তাঁর বিভিন্ন পত্রে অথবা সহযাত্রী কারু ভ্রমণ-বৃত্তান্তে রয়েছে সামান্য সংক্ষিপ্ত মন্তব্য।

বোম্বে (মুম্বাই) থেকে এডেন – সমুদ্র পীড়ায় ভুগে, অবশেষে জাহাজ থেকে মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া বন্দরে নেমে, মানুষের ভাষা ব্যবহার সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের লাভ হল নতুন জ্ঞান:

> এখানকার এক-একটা মাঝি সার উইলিয়াম জোন্‌সের দ্বিতীয় সংস্করণ বললেই হয়। তারা গ্রীক ইটালিয়ান ফ্রেঞ্চ ইংরেজি প্রভৃতি অনেক ভাষায় চলনসই রকম কথা কইতে পারে। শুনলেম ফ্রেঞ্চ ভাষাই এখানকার সাধারণ ভাষা। রাস্তাঘাটের নাম, সাইনবোর্ডে দোকানগুলির আত্মপরিচয়, অধিকাংশই ফরাসি ভাষায় লেখা। ('য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র')

প্রথম যখন য়ুরোপের মাটিতে পা পড়ল রবীন্দ্রনাথের, তাঁর কাছে কিছুই তেমন 'নূতন' বলে মনে হল না। যাহোক, ভালো-মন্দ নানা কিছু দেখে তাঁরা রওনা হলেন ফ্রান্সের পথে। ফ্রান্স পরিত্যাগ অবধি আমরা এখানে রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ করবো:

> রেলোয়ে করে যেতে যেতে আমরা Mount Cenis-এর বিখ্যাত সুরঙ্গ দেখলেম। এই পর্বতের এ-পাশ থেকে ফরাসিরা ও-পাশ থেকে ইটালিয়ানরা, একসঙ্গে খুদতে আরম্ভ করে, কয়েক বৎসর খুদতে খুদতে দুই যন্ত্রিদল ঠিক মাঝামাঝি এসে পরস্পরের সমুখাসমুখি হয়। এই গুহা অতিক্রম করতে রেলগাড়ির ঠিক আধ ঘণ্টা লাগল। সে অন্ধকারে আমরা যেন হাঁপিয়ে উঠছিলেম। এখানকার রেলগাড়ির মধ্যে দিনরাত আলো জ্বালাই আছে, কেননা এক-এক স্থানে প্রায় পাঁচ মিনিট অন্তর এক-একটা পর্বতগুহা ভেদ করতে হয়– সুতরাং দিনের আলো খুব অল্পক্ষণ পাওয়া যায়। ইটালি থেকে ফ্রান্স পর্যন্ত সমস্ত রাস্তা– নির্ঝর নদী পর্বত গ্রাম হ্রদ দেখতে দেখতে আমরা পথের কষ্ট ভুলে গিয়েছিলেম।
>
> সকালবেলায় প্যারিসে গিয়ে পৌছলেম। কী জমকালো শহর ! অভ্রভেদী প্রাসাদের অরণ্যে অভিভূত হয়ে যেতে হয়। মনে হয় প্যারিসে বুঝি গরিব লোক নেই। মনে হল, এই সাড়ে তিন হাত মানুষের জন্যে এমন প্রকাণ্ড জমকালো বাড়িগুলোর কী আবশ্যক। হোটেলে গেলেম, এমন প্রকাণ্ড কাণ্ড যে, ঢিলে কাপড় পরে যেমন সোয়াস্তি হয় না, সে হোটেলেও বোধ করি তেমনি অসোয়াস্তি হয়। স্মরণস্তম্ভ, উৎস, বাগান, প্রাসাদ, পাথরে বাঁধানো রাস্তা, গাড়ি, ঘোড়া, জনকোলাহল প্রভৃতিতে অবাক হয়ে যেতে হয়। প্যারিসে পৌছিয়েই আমরা একটা 'টার্কিশ-বাথে' গেলেম। প্রথমত একটা খুব গরম ঘরে গিয়ে বসলেম, সে-ঘরে অনেকক্ষণ থাকতে থাকতে কারো কারো ঘাম বেরতে লাগল, কিন্তু আমার তো বেরল না, আমাকে তার চেয়ে আর-একটা গরম ঘরে নিয়ে গেল, সে ঘরটা আগুনের

মতো, চোখ মেলে থাকলে চোখ জ্বালা করতে থাকে, মিনিট কতক থেকে সেখানে আর থাকতে পারলেম না, সেখান থেকে বেরিয়ে খুব ঘাম হতে লাগল। তার পরে এক জায়গায় নিয়ে গিয়ে আমাকে শুইয়ে দিলে। ভীমকায় এক ব্যক্তি এসে আমার সর্বাঙ্গ ডলতে লাগল। তার সর্বাঙ্গ খোলা, এমন মাংসপেশল চমৎকার শরীর কখনো দেখি নি। "ব্যূঢ়োরস্কো বৃষস্কন্ধঃ শালপ্রাংশুর্মহাভুজঃ।" মনে মনে ভাবলেম ক্ষীণকায় এই মশকটিকে দলন করার জন্যে এমন প্রকাণ্ড কামানের কোনো আবশ্যক ছিল না। সে আমাকে দেখে বললে, আমার শরীর বেশ লম্বা আছে, এখন পাশের দিকে বাড়লে আমি একজন সুপুরুষের মধ্যে গণ্য হব ; আধ ঘণ্টা ধরে সে আমার সর্বাঙ্গ অবিশ্রান্ত দলন করলে, ভূমিষ্ঠকাল থেকে যত ধুলো মেখেছি, শরীর থেকে সব যেন উঠে গেল। যথেষ্টরূপে দলিত করে আমাকে আর-একটি ঘরে নিয়ে গেল, সেখানে গরম জল দিয়ে, সাবান দিয়ে, স্পঞ্জ দিয়ে শরীরটা বিলক্ষণ করে পরিষ্কার করলে। পরিষ্করণ-পর্ব শেষ হলে আর-একটা ঘরে নিয়ে গেল। সেখানে একটা বড়ো পিচকিরি করে গায়ে গরম জল ঢালতে লাগল, হঠাৎ গরম জল দেওয়া বন্ধ করে বরফের মতো ঠাণ্ডা জল বর্ষণ করতে লাগল ; এইরকম কখনো গরম কখনো ঠাণ্ডা জলে স্নান করে একটা জলযন্ত্রের মধ্যে গেলেম, তার উপর থেকে নীচে থেকে চার পাশ থেকে বাণের মতো জল গায়ে বিঁধতে থাকে। সেই বরফের মতো ঠাণ্ডা বরুণ-বাণ-বর্ষণের মধ্যে খানিকক্ষণ থেকে আমার বুকের রক্ত পর্যন্ত যেন জমাট হয়ে গেল— রণে ভঙ্গ দিতে হল, হাঁপাতে হাঁপাতে বেরিয়ে এলেম। তার পরে এক জায়গায় পুকুরের

মতো আছে, আমি সাঁতার দিতে রাজি আছি কি না জিজ্ঞাসা করলে। আমি সাঁতার দিলেম না, আমার সঙ্গী সাঁতার দিলেন। তাঁর সাঁতার দেওয়া দেখে তারা বলাবলি করতে লাগল, "দেখো, দেখো, এরা কী অদ্ভুত রকম করে সাঁতার দেয়, ঠিক কুকুরের মতো।" এতক্ষণে স্নান শেষ হল। আমি দেখলেম টার্কিশ-বাথে স্নান করা আর শরীরটাকে ধোপার বাড়ি দেওয়া এক কথা। তার পরে সমস্ত দিনের জন্যে এক পাউন্ড দিয়ে এক গাড়ি ভাড়া করা গেল। প্যারিস এক্সিবিশন দেখতে গেলেম। তুমি এইবার হয়তো খুব আগ্রহের সঙ্গে কান খাড়া করেছ, ভাবছ আমি প্যারিস এক্সিবিশনের বিষয় কী না জানি বর্ণনা করব। কিন্তু দুঃখের বিষয় কী বলব, কলকাতার য়ুনিভার্সিটিতে বিদ্যা শেখার মতো প্যারিস এক্সিবিশনের সমস্ত দেখেছি কিন্তু কিছুই ভালো করে দেখি নি। একদিনের বেশি আমাদের প্যারিসে থাকা হল না— সে বৃহৎ কাণ্ড একদিনে দেখা কারো সাধ্য নয়। সমস্ত দিন আমরা দেখলেম— কিন্তু সেরকম দেখায়, দেখবার একটা তৃষ্ণা জন্মাল কিন্তু দেখা হল না। সে একটা নগরবিশেষ। এক মাস থাকলে তবে তা বর্ণনা করবার দুরাশা করতেম। প্যারিস এক্সিবিশনের একটা স্তূপাকার ভাব মনে আছে, কিন্তু শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাব কিছুই মনে নেই। সাধারণত মনে আছে যে চিত্রশালায় গিয়ে অসংখ্য অসংখ্য চমৎকার ছবি দেখেছি, স্থাপত্যশালায় গিয়ে অসংখ্য অসংখ্য প্রস্তরমূর্তি দেখেছি, নানা দেশবিদেশের নানা জিনিস দেখেছি ; কিন্তু বিশেষ কিছু মনে নেই। তার পর প্যারিস থেকে লন্ডনে এলেম— এমন বিষণ্ণ অন্ধকার পুরী আর কখনো দেখি নি— ধোঁয়া, মেঘ, বৃষ্টি,

কুয়াশা, কাদা আর লোকজনের ব্যস্তসমস্ত ভাব। ('য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র')

তৃতীয় পত্রের উপসংহারে তিনি লিখেছেন প্যারিসের এক অপ্রীতিকর পরিস্থিতির কথা :

> আমাদের দিশি কাপড় দেখে রাস্তার এক-একজন সত্যি সত্যি হেসে ওঠে, এক-একজন এত আশ্চর্য হয়ে যায় যে, তাদের আর হাসবার ক্ষমতা থাকে না। কত লোক হয়তো আমাদের জন্যে গাড়ি চাপা পড়তে পড়তে বেঁচে গিয়েছে। প্যারিসে আমাদের গাড়ির পিছনে পিছনে এক দল ইস্কুলের ছোকরা চীৎকার করতে করতে ছুটেছিল, আমরা তাদের সেলাম করলেম। এক-একজন আমাদের মুখের উপর হেসে ওঠে, এক-একজন চেঁচাতে থাকে– "Jack, look at the blackies !"('য়ুরোপ-প্রবাসীর পত্র')

বিলাতে অধ্যয়নের কালে কিছু লাতিন ও ফরাশি তিনি সম্ভবত পড়েছিলেন। অন্তত ফরাশি সমাজবিজ্ঞানী ওগুস্ত কোঁৎ (Auguste Comte 1798-1857)-এর উল্লেখ দেখতে পাই তাঁর পরবর্তীকালের 'জীবনস্মৃতি'-তে। তাঁর মতে, 'তখনকার কালে য়ুরোপীয় সাহিত্যে নাস্তিকতার প্রভাবই প্রবল। তখন বেন্থাম, মিল ও কোঁতের আধিপত্য।'

দেশে ফিরে মেজ-বৌদি জ্ঞানদানন্দিনী দেবী প্রতিষ্ঠিত 'বালক' (১৮৮৫) পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে শিশু-কিশোরদের উপযোগী বহু ধরনের রচনা লেখেন রবীন্দ্রনাথ। এর মধ্যে 'বাংলা সাহিত্যে সব থেকে অভিনব জিনিস হল 'হাস্যকৌতুক'। 'কবি এর আইডিয়া পান পাশ্চাত্য শারাদ (charade) নামক একপ্রকার নাট্য-খেলা থেকে।' (প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্রজীবনকথা' ৩০ পৃ.) প্রসঙ্গত উল্লেখ্য

যে, 'শারাদ' শব্দটির ফরাশি অর্থ হচ্ছে, এক প্রকারের ধাঁধা, এমন একটা শব্দ বের করতে হবে যার ভিন্ন ভিন্ন অংশ রয়েছে, প্রতিটি অংশই এক-একটি শব্দ তৈরি করে; প্রথম, দ্বিতীয় – এভাবে সংজ্ঞায়িত করে। সংজ্ঞাগুলো দৃশ্যের অভিনয়ে পরিবর্তিত হতে থাকে। অর্থবিস্তারে এতে বোঝায়, অদ্ভুত জিনিস বা বোঝা-শক্ত এমন বিষয়।

মেজদাদা ও বন্ধু লোকেন পালিত বিলাত যাচ্ছেন দেখে রবীন্দ্রনাথও তাঁদের সঙ্গী হলেন। 'এবারকার বিলাত-সফর (২২ অগস্ট থেকে-৩ নভেম্বর ১৮৯০) সাড়ে তিন মাসের। তার মধ্যে বিয়াল্লিশ দিন যেতে আসতে জাহাজে কাটে।' (ঐ, ৩৪-৩৫)। এবারের ভ্রমণ উপলক্ষে তিনি লিখলেন, 'য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি'। এখানে আমরা একটু অভিজ্ঞ রবীন্দ্রনাথকে প্রত্যক্ষ করব। ট্রেনে পর্বত সুড়ঙ্গ পার হবার অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি লিখছেন:

> এইবার ফ্রান্স। দক্ষিণে এক জলস্রোত ফেনিয়ে ফেনিয়ে চলেছে। ফরাসি জাতির মতো দ্রুত চঞ্চল উচ্ছ্বসিত হাস্যপ্রিয় কলভাষী।
>
> ফ্রান্সের প্রবেশদ্বারে একবার একজন কর্মচারী গাড়িতে এসে জিজ্ঞাসা করে গেল আমাদের মাসুল দেবার যোগ্য জিনিস কিছু আছে কি না। আমরা বললুম, না। আমাদের একজন বৃদ্ধ সহযাত্রী ইংরেজ বললেন, I don't parlez-vous francaise (parlez- vous francais; অর্থ হল: আপনি কি ফরাশি বলতে পারেন? উদ্ধৃতাংশের শেষ শব্দ 's'- এবং এর পর 'e' হবে না। ভুলটি কি বৃদ্ধ ইংরেজের, না রবীন্দ্রনাথের, তা বোঝা গেল না)।

সেই স্রোত এখনো আমাদের ডান দিক দিয়ে চলেছে। তার পূর্ব তীরে 'ফার্' অরণ্য নিয়ে পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে। চঞ্চলা নির্ঝরিণী বেঁকেচুরে ফেনিয়ে ফুলে নেচে কলরব করে পাথরগুলোকে সর্বাঙ্গ দিয়ে ঠেলে রেলগাড়ির সঙ্গে সমান দৌড় দিয়েছে। মাঝে মাঝে এক-একটা লোহার সাঁকো মুষ্টি দিয়ে তার ক্ষীণ কটিদেশ পরিমাপ করবার চেষ্টা করছে। এক জায়গায় জলরাশি খুব সংকীর্ণ ; দুই তীরের শ্রেণীবদ্ধ দীর্ঘ বৃক্ষগুলি শাখায় শাখায় বেষ্টন করে দুরন্ত স্রোতকে অন্তঃপুরে বন্দী করতে বৃথা চেষ্টা করছে। উপর থেকে ঝরনা এসে সেই প্রবাহের সঙ্গে মিশছে। বরাবর পূর্ব তীর দিয়ে একটি পার্বত্য পথ সমরেখায় স্রোতের সঙ্গে বেঁকে চলে গেছে। এক জায়গায় আমাদের সহচরীর সঙ্গে বিচ্ছেদ হল। হঠাৎ সে দক্ষিণ থেকে বামে এসে এক অজ্ঞাত সংকীর্ণ শৈলপথে অন্তর্হিত হয়ে গেল।

শ্যামল তৃণাচ্ছন্ন পর্বতশ্রেণীর মধ্যে এক-একটা পাহাড় তৃণহীন সহস্র-রেখাঙ্কিত পাষাণ-কঙ্কাল প্রকাশ করে নগ্নভাবে দাঁড়িয়ে আছে ; কেবল তার মাঝে মাঝে এক-এক জায়গায় খানিকটা করে অরণ্যের খণ্ড আবরণ রয়েছে। প্রচণ্ড সংগ্রামে একটা দৈত্য সহস্র সহস্র হিংস্র নখের বিদারণরেখা রেখে যেন ওর শ্যামল ত্বক অনেকখানি করে আঁচড়ে ছিঁড়ে নিয়েছে।

আবার হঠাৎ ডান দিকে আমাদের সেই পূর্বসঙ্গিনী মুহূর্তের জন্যে দেখা দিয়ে বামে চলে গেল। একবার দক্ষিণে, একবার বামে, একবার অন্তরালে। আবার হয়তো যেতে যেতে কোনো এক পর্বতের আড়াল থেকে সহসা কলহাস্যে করতালি দিয়ে আচমকা দেখা দেবে।

সেই জলপাই এবং দ্রাক্ষাকুঞ্জ অনেক কমে গেছে ; বিবিধ শস্যের ক্ষেত্র এবং দীর্ঘ সরল পপ্‌লার গাছের শ্রেণী। ভুট্টা, তামাক, নানাবিধ শাকসবজি। কেবলই যেন বাগানের পর বাগান। এই কঠিন পর্বতের মধ্যে মানুষ বহুদিন থেকে বহুযত্নে প্রকৃতিকে বশ করে তার উচ্ছৃঙ্খলতা হরণ করেছে। প্রত্যেক ভূমিখণ্ডের উপর মানুষের কত প্রয়াস প্রকাশ পাচ্ছে। এ দেশের লোকেরা যে আপনার দেশকে ভালোবাসবে তাতে কিছু আশ্চর্য নেই। এরা আপনার দেশকে আপনার যত্নে আপনার করে নিয়েছে। এখানে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের বহুকাল থেকে একটা বোঝাপড়া হয়ে আসছে, উভয়ের মধ্যে ক্রমিক আদানপ্রদান চলছে, তারা পরস্পর সুপরিচিত এবং ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ। এক দিকে প্রকাণ্ড প্রকৃতি উদাসীনভাবে দাঁড়িয়ে, আর-এক দিকে বৈরাগ্যবৃদ্ধ মানব উদাসীনভাবে শুয়ে– য়ুরোপের সে-ভাব নয়। এদের এই সুন্দরী ভূমি এদের একান্ত সাধনার ধন, একে এরা নিয়ত বহু আদর করে রেখেছে। এর জন্যে যদি প্রাণ না দেবে তো কিসের জন্যে দেবে ! এই প্রেয়সীর প্রতি কেউ তিলমাত্র হস্তক্ষেপ করলে কি আর সহ্য হয় ? আমরা তো জঙ্গলে থাকি ; খালবিল বনবাদাড় ভাঙারাস্তা এবং পানাপুকুরের ধারে বাস করি। খেত থেকে দু-মুঠো ধান আনি, মেয়েরা আঁচল ভরে শাক তুলে নিয়ে আসে, ছেলেরা পাঁকের মধ্যে নেমে চিংড়িমাছ ধরে আনে, প্রাঙ্গণের গাছ থেকে গোটাকতক তেঁতুল পাড়ি, তার পরে শুকনো কাঠকুট সংগ্রহ করে এক-বেলা অথবা দু-বেলা কোনোরকম করে আহার চলে যায় ; ম্যালেরিয়া এসে যখন জীর্ণ অস্থিকঙ্কাল কাঁপিয়ে তোলে

তখন কাঁথা মুড়ি দিয়ে রৌদ্রে পড়ে থাকি, গ্রীষ্মকালে শুষ্কপ্রায় পঙ্ককুণ্ডের হরিদ্‌বর্ণ জলাবশেষ থেকে উঠে এসে ওলাউঠা যখন আমাদের গৃহ আক্রমণ করে তখন ওলাদেবীর পূজা দিই এবং অদৃষ্টের দিকে কোটরপ্রবিষ্ট হতাশ শূন্যদৃষ্টি বদ্ধ করে দল বেঁধে মরতে আরম্ভ করি। আমরা কি আমাদের দেশকে পেয়েছি না পেতে চেষ্টা করেছি ? আমরা ইহলোকের প্রতি ঔদাস্য করে এখানে কেবল অনিচ্ছুক পথিকের মতো যেখানে-সেখানে পড়ে থাকি এবং যত শীঘ্র পারি দ্রুতবেগে বিশ-পঁচিশটা বৎসর ডিঙিয়ে একেবারে পরলোকে গিয়ে উপস্থিত হই।

কিন্তু এ কী চমৎকার চিত্র ! পর্বতের কোলে, নদীর ধারে, হ্রদের তীরে পপ্‌লার-উইলো-বেষ্টিত কাননশ্রেণী। নিষ্কণ্টক নিরাপদ নিরাময় ফলশস্যপরিপূর্ণ প্রকৃতি প্রতিক্ষণে মানুষের ভালোবাসা পাচ্ছে এবং মানুষকে দ্বিগুণ ভালোবাসছে। মানুষের মতো জীবের এই তো যোগ্য আবাসস্থল। মানুষের প্রেম এবং মানুষের ক্ষমতা যদি আপনার চতুর্দিককে সংযত সুন্দর সমুজ্জ্বল করে না তুলতে পারে তবে তরুকোটর-গুহাগহ্বর-বনবাসী জন্তুর সঙ্গে মানুষের প্রভেদ কী ?

৮ সেপ্টেম্বর। পথের মধ্যে আমাদের প্যারিসে নাববার প্রস্তাব হচ্ছে। কিন্তু আমাদের এই ট্রেন প্যারিসে যায় না— একটু পাশ কাটিয়ে যায়। প্যারিসের একটি নিকটবর্তী স্টেশনে স্পেশাল ট্রেন প্রস্তুত রাখবার জন্যে টেলিগ্রাফ করা গেল।

রাত দুটোর সময় আমাদের জাগিয়ে দিলে। ট্রেন বদল করতে হবে। জিনিসপত্র বেঁধে বেরিয়ে পড়লুম। বিষম ঠাণ্ডা।

অনতিদূরে আমাদের গাড়ি দাঁড়িয়ে। কেবলমাত্র একটি এঞ্জিন, একটি ফার্স্টক্লাস এবং একটি ব্রেকভ্যান। আরোহীর মধ্যে আমরা তিনটি ভারতবর্ষীয়। রাত তিনটের সময় প্যারিসের জনশূন্য বৃহৎ স্টেশনে পৌঁছানো গেল। সুপ্তোত্থিত দুই-একজন "মসিয়" আলো-হস্তে উপস্থিত। অনেক হাঙ্গাম করে নিদ্রিত কাস্টম-হাউজকে জাগিয়ে তার পরীক্ষা থেকে উত্তীর্ণ হয়ে একটা গাড়ি ভাড়া করলুম। তখন প্যারিস তার সমস্ত দ্বার রুদ্ধ করে স্তব্ধ রাজপথে দীপশ্রেণী জ্বালিয়ে রেখে নিদ্রামগ্ন। আমরা হোটেল ট্যার্মিনুতে আমাদের শয়নকক্ষে প্রবেশ করলুম। পরিপাটি, পরিচ্ছন্ন, বিদ্যুদুজ্জ্বল, স্ফটিকমণ্ডিত, কার্পেটাবৃত, চিত্রিতভিত্তি, নীলযবনিকাপ্রচ্ছন্ন শয়নশালা ; বিহগপক্ষ সুকোমল শুভ্র শয্যা।

বেশ বদল করে শয়নের উদ্যোগ করবার সময় দেখা গেল আমাদের জিনিসপত্রের মধ্যে আর-একজনের ওভারকোট গাত্রবস্ত্র। আমরা তিনজনেই পরস্পরের জিনিস চিনি নে ; সুতরাং হাতের কাছে যে-কোনো অপরিচিত বস্ত্র পাওয়া যায় সেইটেই আমাদের কারো-না-কারো স্থির করে অসংশয়ে সংগ্রহ করে আনি। অবশেষে নিজের নিজের জিনিস পৃথক করে নেবার পর উদ্‌বৃত্ত সামগ্রী পাওয়া গেলে, তা আর পূর্বাধিকারীকে ফিরিয়ে দেবার কোনো সুযোগ থাকে না।...

৯ সেপ্টেম্বর। প্রাতঃকালে দ্বিতীয়বার বেশপরিবর্তন করবার সময় দেখা গেল আমার বন্ধুর একটি পোর্টম্যান্টো পাওয়া যাচ্ছে না।

পুলিসে সংবাদ দিয়ে প্রাতঃকালে তিনজনে প্যারিসের পথে পদব্রজে বেরিয়ে পড়লুম। প্রকাণ্ড রাজপথ দোকান বাগান প্রাসাদ প্রস্তরমূর্তি ফোয়ারা লোকজন গাড়িঘোড়ার মধ্যে অনেক ঘুরে ঘুরে এক ভোজন-গৃহের বিরাট স্ফটিকশালার প্রান্তটেবিলে বসে অল্প আহার করে এবং বিস্তর মূল্য দিয়ে ঈফেল স্তম্ভ দেখতে গেলেম। এই লৌহস্তম্ভ চারি পায়ের উপরে ভর দিয়ে এক বাগানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। কলের দোলায় চড়ে এই স্তম্ভের চতুর্থ তলায় উঠে নিম্নে সমস্ত প্যারিসটাকে খুব একটা বড়ো ম্যাপের মতো প্রসারিত দেখতে পেলুম।

বলা বাহুল্য, এমন করে একদিনে তাড়াতাড়ি চক্ষুদ্বারা বহির্ভাগ লেহন করে প্যারিসের রসাস্বাদন করা যায় না। এ যেন, ধনিগৃহের মেয়েদের মতো বদ্ধ পালকির মধ্যে থেকে গঙ্গাস্নান করার মতো– কেবল নিতান্ত তীরের কাছে একটা অংশে এক ডুবে যতখানি পাওয়া যায়। কেবল হাঁপানিই সার।

হোটেলে এসে দেখলুম পুলিসের সাহায্যে বন্ধুর পোর্টম্যান্টো ফিরে এসেছে, কিন্তু এখনো সেই পরের হৃত কোর্তা সম্বন্ধে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে আছি।...

২৫ সেপ্টেম্বর। আজ এখানকার একটি ছোটোখাটো এক্‌সিবিশন দেখতে গিয়েছিলুম। শুনলুম এটা প্যারিস এক্‌সিবিশনের অত্যন্ত সুলভ এবং সংক্ষিপ্ত দ্বিতীয় সংস্করণ। সেখানে চিত্রশালায় প্রবেশ করে কারোলু ড্যুরাঁ -নামক একজন বিখ্যাত ফরাসী চিত্রকর-রচিত একটি বসনহীনা

মানবীর ছবি দেখলুম। আমরা প্রকৃতির সকল শোভাই দেখি, কিন্তু মর্তের এই চরম সৌন্দর্যের উপর, জীব-অভিব্যক্তির এই সর্বশেষ কীর্তিখানির উপর, মানুষ স্বহস্তে একটি চির-অন্তরাল টেনে রেখে দিয়েছে। এই দেহখানির স্নিগ্ধ শুভ্র কোমলতা এবং প্রত্যেক সুঠাম সুনিপুণ ভঙ্গিমার উপরে অসীম সুন্দরের সযত্ন অঙ্গুলির সদ্যস্পর্শ দেখা যায় যেন। এ কেবলমাত্র দেহের সৌন্দর্য নয়, যদিও দেহের সৌন্দর্য যে বড়ো সামান্য এবং সাধুজনের উপেক্ষণীয় তা বলতে পারি নে– কিন্তু এতে আরো অনেকখানি গভীরতা আছে। একটি প্রীতিরমণীয় সুকোমল নারী-প্রকৃতি, একটি অমরসুন্দর মানবাত্মা এর মধ্যে বাস করে, তারই দিব্য লাবণ্য এর সর্বত্র উদ্‌ভাসিত। দূর থেকে চকিতের মতো সেই অনির্বচনীয় চির-রহস্যকে দেহের স্ফটিক-বাতায়নে একটুখানি যেন দেখা গেল। ('য়ুরোপ-যাত্রীর ডায়ারি')

২৭ সেপ্টেম্বর ১৯১২ বোম্বে (মুম্বাই) থেকে সিটি অব গ্লাসগো জাহাজে সদলবলে রবীন্দ্রনাথ তৃতীয় বিলাতভ্রমণে বেরুলেন। এবারের পরিধি একটু বৃহত্তর, আয়োজনও বড়। সঙ্গে রয়েছে পুত্র রথীন্দ্রনাথ, পুত্রবধূ প্রতিমা, শান্তিনিকেতনের ছাত্র সোমেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মা। আগের দু বারের মতো এবার রবীন্দ্রনাথ সমুদ্রপীড়ায় ভোগেন নি। অনেক গদ্য রচনা লিখলেন যা 'পথের সঞ্চয়' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। এবং 'লন্ডনে' শীর্ষক কথিকায় আমরা সেবারের প্যারিস অবস্থানের খবর অবগত হই।

সেবার প্রবল বাতাসের কারণে তাঁদের জাহাজ দুদিন পর কুলে ভিড়ল। অতঃপর :

মার্সেল্‌স্‌ হইতে এক দৌড়ে পারিসে আসিয়া এক দিনের মতো হাঁপ ছাড়িলাম। শরীর হইতে সমুদ্রের নিমক সাফ করিয়া ফেলিয়া ডাঙার হাতে আত্মসমর্পণ করিলাম। স্নানাহারের পর একটা মোটর-গাড়িতে চড়িয়া পারিসের রাস্তায় রাস্তায় একবার হুহু করিয়া ঘুরিয়া আসিলাম।

বাহির হইতে দেখিলে মনে হয়, পারিস সমস্ত য়ুরোপের খেলাঘর। এখানে রঙ্গশালার প্রদীপ আর নেবে না। চারি দিকে আমোদ-আহ্লাদের বিরাট আয়োজন। মানুষকে খুশি করিবার জন্য সুন্দরী পারিস-নগরীর কতই সাজসজ্জা। এই কথাই কেবল মনে হয়, মানুষকে খুশি করাটা সহজে সারিবার কোনো চেষ্টা নাই। ('পথের সঞ্চয়')

এরপর একটি অনুচ্ছেদে রবীন্দ্রনাথ আমোদ-প্রমোদের মন্দ দিক নিয়ে আলোচনা করেও মন্তব্য করেছেন: 'মোটের উপরে ইহার ভিতর হইতে মানুষের যে একটা বিজয়ী শক্তির মূর্তি দেখা যাইতেছে তাহাকে অবজ্ঞা করতে পারি না।'

পরদিন রোববার। ফ্রান্সের সীমান্ত অতিক্রম করে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে ডোভারে পৌঁছুলেন তাঁরা। সেখানে ইংরেজ সহযাত্রীদের সঙ্গে ট্রেনে বসে তাঁর 'মনের মধ্যে ভারি একটি আরাম বোধ' হলো। কারণ তিনি যেন 'আত্মীয়দের মধ্যে' এসে পড়েছেন।

মানুষের ভাষা যে আলোর মতো। এই ভাষা যত দূর ছড়ায় তত দূর মানুষের হৃদয় আপনি আপনাকে প্রকাশ করিয়া চলে। ...ফ্রান্সে আমার পক্ষে কেবল চোখের জানা ছিল, কিন্তু হৃদয়ের জানা হইতে বঞ্চিত ছিলাম– সেইজন্যই আনন্দের ব্যাঘাত হইতেছিল। ('পথের সঞ্চয়')

মে ১৫, ১৯২০ ছিল রবীন্দ্রনাথের চতুর্থ বিলাত সফর। এবার কবি ফ্রান্সে এলেন ঘটনাচক্রে। অনেকটা কম গুরুত্বহীন এবং হঠাৎ করে যাওয়া। ২ অগস্ট তাঁর যাওয়ার কথা নরওয়ে। কিন্তু এক আকস্মিক সিদ্ধান্তে আপেক্ষিক ভাবে দীর্ঘ সময়ের জন্য তিনি রওনা হলেন প্যারিসের উদ্দেশ্যে, ৬ তারিখ।

আবহাওয়া দুর্যোগপূর্ণ থাকায় ইংলিশ চ্যানেল, যাকে ফরাশিরা বলে 'লা মঁশ' (La Manche), অতিক্রম খুব সুবিধার হয় নি। যে মেট্রোপলিটন হোটেলে তাঁরা ওঠেন তার পরিবেশ পছন্দ না হলেও 'ইংল্যান্ডের ঠাণ্ডা, স্যাঁৎসেঁতে, অন্ধকার, বিষণ্ন আবহাওয়া মুক্তিই' রবীন্দ্রনাথকে প্রসন্ন করে তুলেছিল। উল্লেখ্য যে, প্যারিসে অগস্ট মাস খুবই রৌদ্রোজ্জ্বল ও আনন্দমুখর থাকে। তবে বেশির ভাগ অভিজাত ফরাশি জুলাই-আগস্ট ভাগাভাগি করে বাইরে বা বিদেশে গ্রীষ্মাবকাশ কাটাতে চলে যান। খবর পাওয়া গেল এক অতিথিশালার। 'ওতুর দ্যু মোঁদ্‌' (তথা 'বিশ্বের চারিপাশ' Autour du monde) শীর্ষক এই অতিথিশালা প্রায়-বন্ধ হলেও প্রতিষ্ঠাতার উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথের জন্য একটি বিশেষ ব্যবস্থা হলো। 'প্যারিসের শহরতলীতে সুরম্য নির্জন স্থানে' এটি এক দুর্লভ সুযোগ। পূর্বরাত্রে প্যারিসের গ্র্যান্ড অপেরায় গ্যেটের 'ফাউস্ট' অভিনয় খুবই উপভোগ করেছিলেন সবাই। অতিথিশালা ও তার চারপাশের মনোরম পরিবেশটি দেখে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত খুশি হয়ে বলেন, 'দেশ ছাড়ার পর এই প্রথম নিজের ঘরে থাকার আনন্দ লাভ করলেম।'

'ওতুর দ্যু মোঁদ' ও তার প্রতিষ্ঠাতা আলবের কান (Albert Kahn, 1860-1940) যেন রূপকথার জগৎ ও মানুষ। চল্লিশ বছর আগে ত্রিশ টাকা মাইনে নিয়ে প্যারিসে এসেছিলেন কান আর এখন তিনি সেখানকার এক প্রধান ক্রোড়পতি। তিনি অবিবাহিত ও নিরামিষাশী।

নিজে একটা ছোট্ট বাড়িতে গরীবের মতো থাকেন কিন্তু তাঁর দানের সীমা নেই। আশেপাশের ১০/১৫টি বাড়িও তাঁর। আর যে বাড়িটি অতিথিশালা 'তার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে এটাকে দেশ-বিদেশের লোকদের একটি মিলনক্ষেত্র করা।' বাড়িটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, সুন্দর ভাবে সাজান। একটি চমৎকার লাইব্রেরিও আছে এবং দুচারটি থাকবার ঘর আছে। অতিথি-সেবার ব্যবস্থা খুব ভালো, পশ্চিমে এরকম দেখা যায় না।---তাছাড়া তাঁদের কর্মক্ষেত্র আছে বিস্তৃত। প্রত্যেক দেশ থেকে দুজন চারজন করে লোককে এঁরা টাকা দিয়ে এক বছরের জন্য পৃথিবীটা ঘুরতে পাঠিয়ে দেন। তাঁরা প্রত্যেকেই একটি বিশেষ কিছু অনুসন্ধান করবার লক্ষ্য রেখে ভ্রমণ করেন এবং ঘোরা শেষ হয়ে গেলে তাঁদের প্রতিবেদন লিখে দেন। কানের বাগানটি খুবই বিখ্যাত; 'প্রকাণ্ড জায়গা নিয়ে বাগান, তার কোথাও কৃত্রিম পাহাড় পর্বতের দেশ-পাইনের জঙ্গল, কোথাও উপত্যকার মধ্যে নিচু মাঠ-জমি-পদ্ম পুকুর – কোথাও কৃত্রিম চীন-জাপানিমুলুক – ছোট ছোট ঝরণা, বাঁকা-চোরা গাছপালা আবার কোথাও ফরাসী-ফল বাগিচা।'

রবীন্দ্রনাথ এই মনোরম পরিবেশে কাটান ৮ থেকে ২৫ আগস্ট। পরদিন তাঁরা সন্ধ্যায় দক্ষিণ ফ্রান্সের সমুদ্রোপকূলে আল্পসের অংশ কাপ মারত্যাঁ-য় (Cap Martin) কানের এক প্রাসাদের লক্ষ্যে ট্রেন যাত্রা করেন। পথে এক দুর্ঘটনা ঘটে। আমরা রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তা শুনি। তিনি তাঁর কন্যা মীরা দেবীকে লেখেন:

> 'আমরা দক্ষিণ ফ্রান্সে সমুদ্রের ধারে পাহাড়ের উপর ভারী সুন্দর একটা জায়গায় এসেচি। ... কিন্তু এমনি অদৃষ্ট যে আমাদের কয়জনেরই তোরঙ্গ রেলের থেকে খোয়া গেছে। তাতে আমাদের সব কাপড় ছিল, বইও ছিল। ... তাই

> এখানে তিন চার দিন মাত্র কাটিয়েই আজ ... প্যারিসে ফিরে যাচ্চি।'

এর আগে ২১ আগস্ট বিকেলে আলবের কান কবিকে নিয়ে গেলেন র‍্যাঁস-এর (Rheims) নিকটবর্তী যুদ্ধবিধ্বস্ত এলাকাগুলো দেখাতে। শহরে পৌঁছুতে রাত এগারোটা বেজে গেল। অন্যতম অক্ষত হোটেল 'গ্র্যান্ডে' তাঁরা ওঠেন। প্রবেশের পূর্বেই তাঁরা ধ্বংসলীলা দেখতে পাচ্ছিলেন। কিন্তু শহরে ঢুকে দেখলেন এক কালের সমৃদ্ধ নগরীটি তখন ভগ্নস্তূপে পরিণত – ভাঙা বাড়ি ও কয়েকটি শীর্ণকায় কুকুর ছাড়া সেখানে আর কেউ নেই।

এর মধ্যে:

> 'একদিন ভর সন্ধ্যাবেলায় সদলবলে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে কান সাহেব যখন গিয়েছেন রেস্তোরাঁ প্রোভোস্ত–এ 'চকোলেট' খেতে – এক মজার ব্যাপার ঘটে। রবীন্দ্রনাথকে দেখামাত্র চিনতে পেরে এক ফরাসী ছোকরা চকোলেট খাওয়া ভুলে উঠে দাঁড়াল, তারপর নিঃসংকোচে জোরালো গলায় আবৃত্তি করে গেল ফরাসী সংস্করণ গীতাঞ্জলির একটি কবিতা, 'চিত্ত যেথা ভয় শূন্য, উচ্চ যেথা শির।' শ্রোতারা স্তব্ধ। রবীন্দ্রনাথ উপভোগ করলেন ব্যাপারটা। এই ছোট ঘটনা থেকে বোঝা যায় প্রথম মহাযুদ্ধের দিন-বদলের পালার মধ্যে ফ্রান্স ভুলতে পারেনি রবীন্দ্রনাথকে। বরং রবীন্দ্রনাথের অপরূপ ব্যক্তিত্ব প্রত্যক্ষ করে ফরাসীরা তাঁর মধ্যে নতুন করে পেল এক নবীর প্রত্যয়, পেল যেন ত্রাণের বার্তা।' (পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, 'ফরাসীদের চোখে রবীন্দ্রনাথ')

রবীন্দ্রনাথ কখনো মোঁপেলিয়ে (Montpélier) যাননি, কিন্তু এই সুন্দর ভূখণ্ডে যে বিশ্ববিদ্যালয়টি ছিল, তার জন্যে প্রস্তাবিত ভারতীয় কলেজ বা ইনস্টিটিউটের প্রেসিডেন্ট করা হয়েছিল কবিকে। এটা হলো অধ্যাপক প্যাট্রিক গ্যাডেস-এর (Patrick Geddes) কীর্তি। তিনি রবীন্দ্রনাথের জন্যে এই বিশেষ সম্মাননার ব্যবস্থা করেছিলেন। গ্যাডেস এডিনবরার লোক। ডারউইনের ছাত্র, প্রাণীবিজ্ঞানী ও সমাজতাত্ত্বিক। জগদীশচন্দ্র বসুর জীবনীকার। শান্তিনিকেতনেও এসেছিলেন। তাঁর পুত্র আর্থার (Arthur Geddes) শ্রীনিকেতনে কিছুকাল গবেষণা ও অধ্যাপনা করেন। তাঁর ডক্টরেটের অভিসন্দর্ভ Au pays de Tagore... শান্তিনিকেতন-সংশ্লিষ্ট সুরলের ভৌগোলিক পরিবেশগত বিষয়াদি নিয়ে লেখা কাজ।

ফ্রান্স থেকে নেদারল্যান্ডস ও বেলজিয়াম হয়ে রবীন্দ্রনাথ গেলেন আমেরিকায়। সেখানে সাড়ে চার মাস কাটিয়ে তিনি ১৯ মার্চ ১৯২১ তারিখে ইংল্যান্ডে চলে আসেন। উল্লেখ্য যে, নাইটহুড ত্যাগের কারণে ইংরেজ কূটনীতিকরা আমেরিকায় তাঁর বিরুদ্ধে প্রচারকার্যে সক্রিয় ছিল। ইংল্যান্ডেও তাঁর যথাযথ সমাদর হয়নি তখন। অথচ য়ুরোপের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে তাঁকে সাদর আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছিল। 'যুদ্ধ বিধ্বস্ত হতাশা পীড়িত' য়ুরোপে তাঁর অনুরাগীর সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছিল। ১৬ এপ্রিল ১৯২১-এ একটি ছোট বিমানে চড়ে রবীন্দ্রনাথ পুত্র, পুত্রবধূ সহ বার জন যাত্রীর সঙ্গে প্যারিসে আসেন। অভ্যর্থনার জন্য আলবের কান বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন। বিমান অবতরণের দৃশ্য চলচ্চিত্রে ধারণ করা হয়। তাঁরা কানের অতিথিশালায় অবস্থান করেন। বহুবিচিত্র অভিজ্ঞতা ও বিদগ্ধজনের সাক্ষাৎ লাভে রবীন্দ্রনাথ আপ্লুত। তবে তখন থেকে তাঁর প্রধান চিন্তা ও কাজ বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা। লন্ডনে মন্টেগু, লর্ড কারমাইকেল প্রমুখ সহানুভূতিশীল ব্যক্তি

তিনি পেয়েছেন, এখন ফ্রান্সে প্রাচ্য সমিতিসমূহ তাঁকে সহায়তা দান করবে এতে তিনি নিঃসন্দেহ। তবে তিনি বিশেষভাবে ভরসা করছেন অধ্যাপক সিলভ্যাঁ লেভি (Sylvain Lévi, 1863-1935) ও সাহিত্যিক রম্যাঁ রল্যাঁ-র (Romain Rolland, 1868-1944) ওপর।

রথীন্দ্রনাথের ডায়েরি সূত্রে জানা যায় যে, মসিয় দ্য জার্দ্যাঁ (M Dejardin) বলে একজনকে তাঁরা মধ্যাহ্নভোজনে নিমন্ত্রণ করেছেন ২০ এপ্রিল। পরদিন দুপুরে আবার রম্যাঁ রল্যাঁ ও তাঁর বোনের দাওয়াত। আলোচনার বিষয়বস্তু রল্যাঁর বইতে বিস্তারিত আছে। ঐদিন বিকেলে ম্যুজে গিমে-তে (Musee Guimet) রবীন্দ্রনাথ An Indian Folk Religion শীর্ষক এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। তিন-চারশো দর্শক-শ্রোতা উপস্থিত ছিল বলে লিখেছেন রথীন্দ্রনাথ। 'অব্যবস্থার কারণে' অনেকে আসতে পারেন নি বলে বলা হলেও আমাদের বিবেচনায় অকুস্থলে এটি এক যথেষ্ট ভালো আয়োজন। তাছাড়া সভাপতি এমিল সেনার-এর মতো শিক্ষাবিদ, পণ্ডিত-ব্যক্তিত্ব রবীন্দ্রনাথকে একটি রাষ্ট্রীয় পদকও প্রদান করেন। সেখান থেকে শান্তিনিকেতনের জন্য ৩৫০টি মূল্যবান গ্রন্থ উপহার দেওয়া হয়। (আমাদের সংগ্রহে একটি মূল্যবান পুস্তিকা রয়েছে – 'Bulletin De İ'Association Française des Amis de l' Orient' . Juin, 1921, এতে রবীন্দ্রনাথ প্রদত্ত ২১ এপ্রিলের বক্তৃতার অংশবিশেষ ফরাশি ভাষায় উদ্ধৃত (৩৩-৫৪)। প্রতিষ্ঠানটি ৪০ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির একটি নৈশভোজের আয়োজন করে রবীন্দ্রনাথের সম্মানার্থে।)

২২ এপ্রিল নৈশভোজনের পর কোঁতেস দ্য নোয়াই (Comtesse Anne Elisabeth Mathieu de Noailles, 1876-1933) এসেছিলেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। কিন্তু কান তাঁদের সিনেমা দেখিয়ে কালক্ষেপণ করলে পর্যাপ্ত আলোচনার সুযোগ হয়নি বলে অনুযোগ করেছেন রথী। এর মধ্যে ফ্রান্সে প্রবাসী কিছু ভারতীয় ব্যবসায়ী ও

সাবেক বিপ্লবী বিশ্বভারতীর জন্য বইপত্র, হয়তো কিছু অনুদানেরও ব্যবস্থা করেন।

এক সন্ধ্যায় রবীন্দ্রনাথ ভাগনারের গীতিনাট্য 'Valkyre' অভিনয় দেখে মুগ্ধ হয়ে যান। এই প্রসঙ্গে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মন্তব্য করেন,

> 'উৎকৃষ্ট কবিতা, সংগীত ও অভিনয় – এই তিনের সমবায়ে যে কী অপরূপ আর্ট সৃষ্ট হইতে পারে রবীন্দ্রনাথ তাহা প্রত্যক্ষ করেন। পরযুগে কবি যে গীতোৎসব রচনা করেন, তাহার উপর কী ইহাদের প্রভাব পড়িয়াছিল? কোন রস, কোন সুর কিভাবে মনে অবচেতনে তলাইয়া যায় ও কী রূপে কখন তাহা রূপ গ্রহণ করে, সেই রহস্য উদঘাটন করিবেন মনস্তাত্ত্বিক – ঐতিহাসিক নহে।' ('রবীন্দ্রজীবনী')

২৩ এপ্রিল দার্শনিক অঁরি বেগসোঁ (Henri-Louis Bergson, 1859-1941) আসেন। ডিনারে 'আকর্ষণীয় আলাপ আলোচনা' হয়। নৈশভোজনের পর তাঁরা এক সঙ্গীতানুষ্ঠানে যোগ দেন।

পূর্বনির্ধারিত স্পেন সফর বাতিল করে কবি স্ত্রাসবুর্গ গেলেন ২৭ এপ্রিল। ৫০ বৎসর পর ফ্রান্স জার্মানি থেকে এই অঞ্চল ফিরে পায় ১ম মহাযুদ্ধের শেষে। তাই সেখানে ফরাশি সংস্কৃতির প্রসারের প্রয়াস চলছে জোরেসোরে। সেজন্যে সিলভ্যাঁ লেভি সেখানে কর্মরত। তাঁরই উদ্যোগে রবীন্দ্রনাথ সেখানে যান এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে The Massage of the Forest শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন। সেখানে তিনি মাদাম আতে-র (Hattée) বাড়িতে অতিথি ছিলেন। পরদিন তিনি শহরের দর্শনীয় ক্যাথিড্রাল, কমলালেবুর বাগান প্রভৃতি দেখেন। অপরাহ্নে লেভি প্রদত্ত সংবর্ধনায় যোগ দেন। রবীন্দ্রনাথের স্ত্রাসবুর্গ খুব পছন্দ হয়েছিল। এসময়ের লেখা চিঠিপত্রে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে।

এর পর রবীন্দ্রনাথ জেনেভা, লোজান, ল্যুসের্ন, জুরিখ প্রভৃতি শহর সফর করেন। উল্লেখ্য যে, সবখানেই ফরাশি ও জার্মান ভাষার বিদগ্ধ বুদ্ধিজীবীদেরই একত্র সন্নিবেশ ঘটে।

১৯২৪ সালে কবি কলকাতা থেকে মাদ্রাজ হয়ে কলম্বো গিয়ে জাপানী মালবাহী জাহাজ হারুনা-মারু তে চড়ে ফ্রান্সের উদ্দেশে রওনা দেন, ২৪ সেপ্টেম্বর, এবং মার্সেই পৌঁছান ১১ অক্টোবর। পরদিন সদলবলে প্যারিসে এসে আশ্রয় গ্রহণ করেন কানের অতিথিশালায়। এর পরদিন সকালে আমেরিকান এক্সপ্রেস অফিসে পেরুর জাহাজের টিকিটের ব্যবস্থা করতে যান তিনি।

সেদিন সকালে পেরুর এক মন্ত্রীর সঙ্গেও তাঁর দেখা হয়। দুপুর সাড়ে বারটায় অধ্যাপক সিলভ্যাঁ লেভীর সঙ্গে করেন মধ্যাহ্ন ভোজন। ১৬ অক্টোবর সকাল সাড়ে ৯টায় অধ্যাপক প্যাট্রিক গেডেসের ব্যবস্থাপনায় স্যাঁ-ক্লুতে মিস্টার উইলসনের স্টুডিও পরিদর্শন করেন রবীন্দ্রনাথ। দুপুরে মাদাম তুলম্যাঁর সঙ্গে মধ্যাহ্ন ভোজন সেরে মাদাম রানার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তাঁর বাসভবনে।

১৮ অক্টোবর সকাল সাড়ে দশটায় এলমহার্স্ট (L. K. Elmharst, 1893- 1970)-কে নিয়ে ফ্রান্সের শেরবুর্গ বন্দর থেকে আন্দেজ জাহাজে দক্ষিণ আমেরিকা রওনা দেন কবি। জাহাজে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। পেরু যাত্রা স্থগিত রেখে আর্জেন্টাইনার বুয়েনোস-এরেস বন্দরে অবতরণ করেন। এক বিরাট সংবর্ধনা তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল তখন। সেখানে 'বিজয়া' তথা ভিত্তরিয়া দা এসত্রাদা ওরফে ভিক্তোরিয়া ওকাম্পোর সঙ্গে সম্পর্কের ভিত্তিতে রচিত হলো এক ভিন্ন কাহিনী।

১২ মে ১৯২৬, মুম্বাই হয়ে ইটালি গমন। কবির সঙ্গে রথী, প্রতিমা, নন্দিনী, প্রেমচাঁদ পাল (শ্রীনিকেতনের সচিব) ও গৌর গোপাল ঘোষ

(শান্তিনিকেতনের শিক্ষক; সমবায় সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জনের উদ্দেশে বিলাত যাত্রা)। পরে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ, কবির অতি ঘনিষ্ঠজন এবং তাঁর স্ত্রী নির্মলকুমারী তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন। ২২ জুন তিনি ইটালী থেকে এলেন সুইজারল্যান্ডে, রম্যাঁ রল্যাঁ সকাশে। তিনি থাকেন ভিলন্যভ নামক পার্বত্য অঞ্চলে, স্বাস্থ্যকর ও সুন্দর জনবিরল শহর। রবীন্দ্রনাথের জন্য রাখা হয়েছে হোটেল বায়রনের সেই কক্ষ যাতে দীর্ঘকাল বাস করেছিলেন ভিক্তর য়্যাগো। জানালা দিয়ে দেখা যায় এক সুদৃশ্য হ্রদ। কাছেই থাকেন রল্যাঁ। বোনকে নিয়ে প্রায়ই আসেন- সাহিত্য, শিল্প, সংগীত ও ভারতীয় রাজনীতি তাঁদের আলোচনার প্রসঙ্গ।

দুসপ্তা নাগাদ সেখানে থাকার পর সুইজারল্যান্ড ও অস্ট্রিয়ার কিছু আমন্ত্রণ ও অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে জুলাই-এর শেষে কবি এলেন প্যারিসে। উঠলেন ওতুর দ্যু মোদ অতিথিশালায়। সস্ত্রীক লেভি, অধ্যাপক জ্যুল ব্লক প্রমুখের সঙ্গে সময় কাটান। সভা-সমিতি পরিহার করে চলেছেন। কেননা ইটালিতে মুসোলিনি ও ফ্যাসিবাদের কবলে পড়ে যা ঘটেছে তাতে তাঁর মন 'বিচলিত'। প্যারিস থেকে লন্ডনের কয়েকটি শহর হয়ে নরওয়ে, ডেনমার্ক, জার্মানি, চেকোস্লোভাকিয়া, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি, যুগোস্লাভিয়া, রোমানিয়া, গ্রীস, মিশর প্রভৃতি দেশে অল্পস্বল্প থেমে সাতমাসের য়ুরোপ সফর শেষ করে রবীন্দ্রনাথ দেশে ফিরলেন ডিসেম্বরের মাঝামাঝি।

আমরা জানি, রবীন্দ্রনাথ শেষবার য়ুরোপে গেলেন ১৯৩০ সালে। ২ মার্চ রওনা দিয়ে মার্সেই পৌছুলেন ২৬ মার্চ। তাঁর সঙ্গে পুত্র, পুত্রবধূ, তাঁদের পালিতা কন্যা এবং সচিব আরিয়াম তথা আর্যনায়কম। চিকিৎসা ও বিশ্রামের জন্য রবীন্দ্রনাথের এবারের ভ্রমণ। কিন্তু পথে

অসুস্থ হয়ে পড়লেন পুত্র রথীন্দ্রনাথ। তাঁর জন্য মাদ্রাজ থেকে একজন চিকিৎসককেও সঙ্গে নিতে হল। খুব কাছাকাছি না হলেও তাঁরা গিয়ে উঠলেন কানের কাপ মার্ত্যাঁ-র প্রাসাদে। সমুদ্রসৈকতে আকর্ষণীয় এই পর্যটন কেন্দ্রে কবির সঙ্গে 'দেখাশুনা' হলো চেকোস্লোভাকিয়ার প্রখ্যাত প্রেসিডেন্ট মাজারিক-এর (Masaryk)।

রবীন্দ্রনাথের এখন লেখালেখির দিকে আর মন নেই, তিনি ছবি এঁকে চলেছেন ঘোরের মধ্যে। সচিবকে নিয়ে তিনি প্যারিস রওনা হলেন। পৌছেই প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা দেবীকে লিখলেন:

> ধরা তলে যে রবিঠাকুর বিগত শতাব্দীর ২৫ বৈশাখে অবতীর্ণ হয়েছেন তাঁর কবিত্ব সম্প্রতি আচ্ছন্ন– তিনি এখন চিত্রকররূপে প্রকাশমান– (২৬ এপ্রিল, ১৯৩০/ চিঠিপত্র ৫, পত্র ৩২, পৃ. ৭৩)

অনেক কাঠখড় খরচ করে গাল্‌রি পিগাল্ (Galerie Pigalle)-এ রবীন্দ্রনাথের প্রথম চিত্র-প্রদর্শনী হল ২ মে। ছবি ১২৫ খানি। সে-এক মারাত্মক ব্যাপার! ভাগ্যিস, দুই জাঁদরেল মহিলা ছিলেন রবীন্দ্রনাথের পাশে– কোঁতেস দ্য নোয়াই আর ভিক্তোরিয়া ওকাম্পো। যথাসময়ে আর্জেন্টিনা থেকে ফ্রান্সে এসে বহু অর্থ ব্যয়ে সুন্দর আয়োজন করে ফেললেন ভিক্তোরিয়া। রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছা – অঁদ্রে জিদ প্রদর্শনী ক্যাটালগের ভূমিকা লিখুন। কিন্তু পূর্ব-নির্ধারিত জার্মানি সফরের জন্যে তিনি তা করতে পারেন নি। এই দায়িত্ব পড়ল কোঁতেস-এর উপর। উদ্বোধনীতে অভূতপূর্ব সাফল্য, রবীন্দ্রনাথ খুশি। একটি পত্রে তিনি লিখেছেন :

> ফ্রান্সের মত কড়া হাকিমের দরবারেও শিরোপা মিলেচে– কিছুমাত্র কার্পণ্য করেনি। (অক্সফোর্ড, মে ২৭)

যাহোক, আমরা কড়া হাকিমদের অনেকের অসামান্য নরম কণ্ঠস্বর শুনবো 'ফরাশি সুজন' অধ্যায়ে।

'গীতাঞ্জলি' ও অন্যান্য অনুবাদ

১৯১২ খ্রিষ্টাব্দে লন্ডন যাবার সময় পথে প্যারিসে খুবই স্বল্পকালীন অবস্থানের সময় সম্ভবত সুইডিশ অধ্যাপক টেগনার-এর (Essaias Henrik Vilhem Tegner, 1845-1928) সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। টেগনার বাংলা জানতেন এবং তিনি ছিলেন নোবেল পুরস্কার কমিটির অন্যতম সদস্য। 'রবিজীবনী'-এর প্রশান্তকুমার পাল এক জায়গায় লিখেছেন যে, তিনি নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির ব্যাপারে 'উল্লেখযোগ্য ভূমিকা' রেখেছেন, কিন্তু পরে লিখছেন, 'তিনিও কমিটির সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করতে পারেননি'। প্রসঙ্গটি উত্থাপিত হলো এই জন্য যে, টেগনার পরে এক বক্তৃতায় বলেছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর প্যারিসে সাক্ষাৎ হয়েছিলো। অথচ রবীন্দ্রনাথ এ সম্পর্কে কিছু বলেন নি। একে তো তাঁর সময় ছিল না কারু সাথে সাক্ষাতের। নতুবা যাত্রার আগে কলকাতায় ফরাশি মহিলা দাভিদ-নেল তাঁকে যে কয়খানি পরিচয়পত্র দিয়েছিলেন, তাঁদের কারু সাথে তিনি সাক্ষাৎ করেন নি।

তবে আমাদের কাছে যা এখন গুরুত্বপূর্ণ, তা হলো বিলাতে বিদগ্ধজনের কাছে 'গীতাঞ্জলি' পাঠ করার আসরে উপস্থিত ছিলেন একজন প্রতিভাবান তরুণ ফরাশি কবি। বয়স মাত্র পঁচিশ। তিনি স্যাঁ জন পের্স (কলমি নাম) ওরফে আলেক্সি স্যাঁ লেজে লেজে (Saint-John Perse alias Alexis Saint Leger Leger 1887-1975, Nobel laureate, 1960) ; এই ঘটনা রবীন্দ্রনাথ ও উক্ত কবি বিবৃত করেছেন বিস্তৃতভাবে।

১৭ অক্টোবর, ১৯১২ পের্স-এর সঙ্গে সাক্ষাতের বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং এক চিঠিতে লিখেছেন,

কাল সকালে একজন ফরাসী গ্রন্থকার আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তিনি প্রথমে আমার তর্জ্জমাগুলো পড়ে খুব উত্তেজিত হয়ে আমার কাছে এসেছেন। তিনি বল্লেন, তোমার মত কবির জন্যে আমরা অপেক্ষা করে আছি। আমাদের Lyrics-এ আমরা কেবল accidental নিয়ে বদ্ধ হয়ে আছি... তোমার লেখা দেশকালের অতীত, চল তুমি আমাদের ফ্রান্সে চল, সেখানে তোমাকে আমাদের প্রয়োজন আছে ইত্যাদি। ইনি আমার এই তর্জ্জমাগুলো ফরাসীতে অনুবাদ করবার অনুমতি নিয়ে গেলেন।

২৩ অক্টোবর পের্স এক পত্রে প্যারিসে অঁদ্রে জিদ-কে (André Gide 1869-1951) এর অনুবাদে উদ্বুদ্ধ করেন। কেননা তাঁর কাছে এটাকে মনে হয়েছে 'The only really poetic English language work to have appeared in a long time.'

২৮ জানুয়ারি পের্স জিদকে আবার লেখেন অনুবাদ সাময়িকীতে না বই আকারে প্রকাশ করতে চান তা যেন তিনি জানান এবং এ ব্যাপারে তিনি নিজেই রবীন্দ্রনাথকে চিঠি লিখবেন। এরপর পের্স রবীন্দ্রনাথকে ফরাশি ভাষায় একটি পত্র দেন এবং তাতে ইতিমধ্যে উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন। কারণ পের্স জেনেছেন যে, ফরাশি ভাষায় অনুবাদ করতে ইচ্ছুক এমন তিন জনের সঙ্গে কবির পক্ষে স্ট্রেংওয়েজ কথাবার্তা বলছেন। সুতরাং,

'আপনার প্রতি আমার সর্বান্তকরণ শ্রদ্ধার দোহাই দিয়ে এবং আমি ও আমার বন্ধুরা আপনার অতুলনীয় কাব্যের প্রতি যে আনুগত্যের শপথ নিয়েছি তারও দোহাই দিয়ে আপনাকে মিনতি করছি, ঐসব কথাবার্তা এখন বন্ধ রাখুন। কেননা

আঁদ্রে জীদের মতো একজন লেখক কখনও নিজের মৌলিক রচনা ফেলে কোন কারণে বিষয়ান্তরে ব্যাপৃত হতে পারেন এমন কথা তাঁর সম্বন্ধে কেউ বিশ্বাসই করতে পারেন না। সেই আঁদ্রে জীদই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আপনার কবিতাগুলি অনুবাদ করবার জন্য গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। অনুবাদের কাজটি এ রকম হাতে ন্যস্ত থাকার মূল্যটা যে কী, সম্ভবত ফক্স স্ট্রাংওয়েজ অথবা আপনি স্বয়ং ঠিক হৃদয়ঙ্গম করতে পারছেন না।... আশা করি, আপনার সেই চিঠিটি অচিরেই পাবো যার ফলে জীদ অনিশ্চয়তার হাত থেকে মুক্ত হবেন এবং তাঁর অনুবাদের কাজটিও সুসম্পন্ন করতে পারবেন। তাঁর ইচ্ছা, তিনি অনুবাদ প্রথমে পত্রিকায় প্রকাশ করবেন যাতে অধিকসংখ্যক পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পরে পুস্তকাকারে প্রকাশ করবেন, এই ব্যাপারে শর্তাদি আপনার পক্ষে যতদূর অনুকূল হতে পারে তাই হবে। কেননা জীদ এই অনুবাদের ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ।' (অধ্যাপক সৌরিন্দ্র মিত্র অনূদিত, প্রশান্তকুমার পাল কর্তৃক উদ্ধৃত)

জঁ দ্য রোজেন (Jean H.de Rosen) নামে এক অনুরাগী ইংরেজি থেকে 'গীতাঞ্জলি'র ১৫টি কবিতা ফরাশিতে অনুবাদ করেন এবং পাক্ষিক পত্রিকা 'লা রভ্যু' (La Revue 15 April, 1913)-তে প্রকাশ করেন। তিনি রবীন্দ্রনাথকে লেখেন যে, তাঁর বন্ধু ভিক্তর গ্লোলুতে (Victor Glolouter) পুরো বইটা অনুবাদের প্রস্তাব করছেন।

শেষ অবধি জিদ স্বত্ব পান এবং 'লা নুভেল রভ্যু ফ্রঁসেজ' ('La Nouvlle Revue Française') পত্রিকায় ২৬ নভেম্বর ১৯১৩ সালে ২৫ টি কবিতা প্রকাশিত হয়। প্রখ্যাত প্রকাশক গালিমার 'L'Offrande

lyrique/ Gitanjali' নামে এটি প্রকাশ করে, তবে ৫০০ কপি মাত্র। অল্প কিছু দিন পর জিদের ভূমিকাসহ এর পুনর্মুদ্রণ ঘটে। এটি উৎসর্গ করা হয়েছে স্যাঁ লেজে লেজে তথা স্যাঁ-জন পের্স-কে। উৎসর্গপত্রে জিদ উল্লেখ করেন যে, অন্য কোনো বইয়ের জন্য তাঁকে অতখানি যত্নবান হতে বা পরিশ্রম করতে হয় নি, যতখানি করতে হয়েছে 'গীতাঞ্জলি'র জন্যে। বর্তমানে আমাদের সংগ্রহে ২০০৪ সালের যে সংস্করণটি রয়েছে তার সঙ্গে 'লা কর্বেই দ্য ফ্রুই' (La Corbeille de Fruits) যোগ করা হয়েছে। এটি হচ্ছে এলেন দ্য পাসকিয়ে (Hélène de Pasquier) কৃত ইংরেজি 'Fruit Gathering'-এর অনুবাদ।

ফরাশিভাষীদের কাছে সুপরিচিত প্রথম বাংলা শব্দ সম্ভবত 'গীতাঞ্জলি', কেউ কেউ ভুলক্রমে উচ্চারণ করে থাকেন 'জিতঁজলি'।

জিদ তাঁর ভূমিকায় ঋকবেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত থেকে শুরু করে পাসকাল, মুসসে, গ্যেটে, বাখ-শুমান সংগীতধারা, বোদ্‌লের প্রভৃতি বিবিধ প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করে 'গীতাঞ্জলি'র সঙ্গে অন্যান্য চিন্তাধারার সম্পর্ক-বিচারে প্রবৃত্ত হয়েছেন। ইতিমধ্যে তিনি রবীন্দ্রনাথের 'The Crescent Moon', 'The Gardener', 'The Post Office', 'Sadhana' পড়ে ফেলেছেন।

'গীতাঞ্জলি'র পর কোন্ সূত্রে 'ডাকঘর' অনুবাদ করলেন তিনি, তা আমাদের জানা নেই। তবে এই অনুবাদ, যার শিরোনাম 'অমল এ লা লেৎর দ্যু রোয়া' ('Amal et la lettre du roi', 1924/ 'অমল এবং রাজার চিঠি') এখন অবধি খুবই জনপ্রিয় নাটক।

শান্তিনিকেতনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন সুইস-ফরাশি বহুভাষাবিদ অধ্যাপক ফেরনঁ বনোয়া (Fernand Benoît); রবীন্দ্রনাথ তাঁর সহায়তায় 'রক্তকরবী' অনুবাদ করেন ইংরেজিতে। তিনি স্বয়ং লিখছেন,

রবীন্দ্রনাথ এবং আনা দ্য নোয়াই, পারি, ১৯২০

(বাঁ দিক থেকে) রল্যাঁর বাবা, রল্যাঁর বোন, রবীন্দ্রনাথ, রমাঁ রল্যাঁ, প্রতিমা দেবী ও অন্যরা

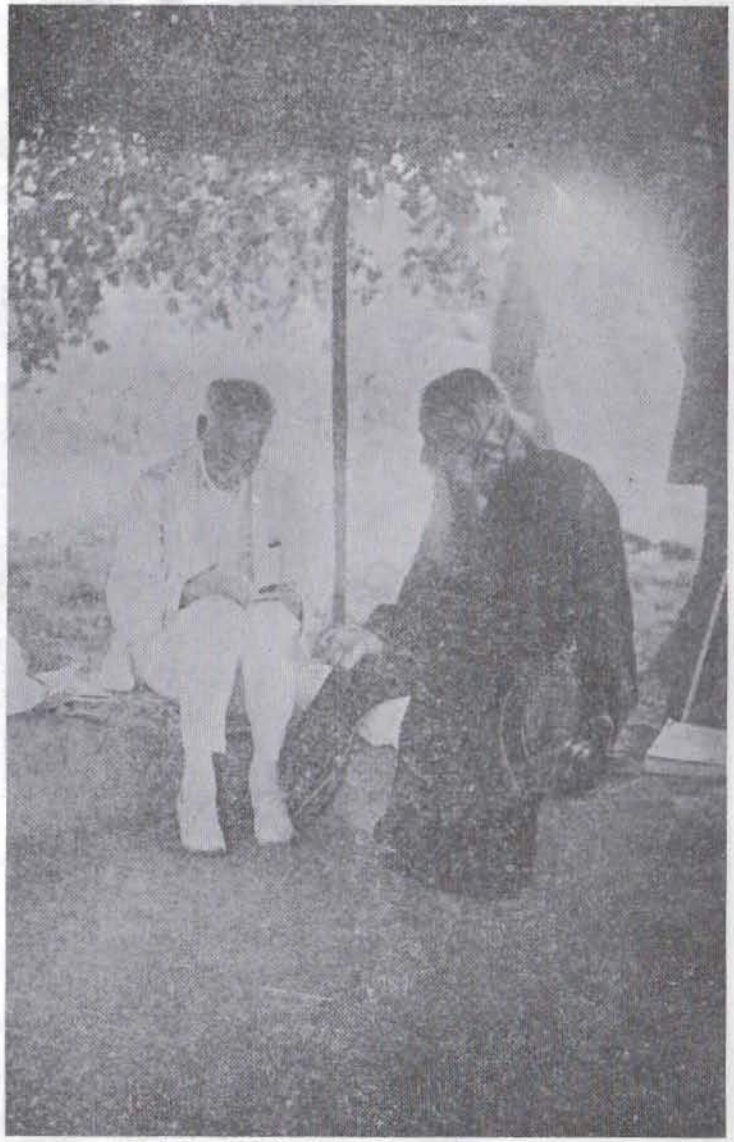

শান্তিনিকেতনে সিলভ্যাঁ লেভি এবং রবীন্দ্রনাথ, ১৯২২

গ্যালারী পিগাল-এর সামনে ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ও অন্যরা

'বেনোয়াকে নিয়ে এখনও আমার নন্দিনীর তর্জ্জমা করে চলেচি। কাল সকালে বোধহয় শেষ হয়ে যাবে।'

পরে বনোয়া আর অমিয় চক্রবর্তী মিলে অনুবাদ করেন 'মুক্তধারা'। যার ফরাশি নাম 'লা মাশিন' 'La machine' এবং ১৯২৯ সালের মধ্যে যার সাতটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। এতে ভূমিকা লেখেন মার্ক এলমার (Mark Elmar) যিনি 'The Golden Book of Tagore' (১৯৩১)-এর জন্যেও একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। তাঁর মতে, 'বাংলার চাষী ও বাংলার ফুলের নাম অমর করে', প্রাচ্যের সমস্ত ব্যথা অনুভব করে, বিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পরিক্রমা করেছেন রবীন্দ্রনাথ; ভারতের জন্য সংগ্রাম, 'প্রাচ্যকে পাশ্চাত্যের সান্নিধ্যে আনা, শোচনীয়তম বিশ্ব পরিস্থিতির সমাধান' করা হল তাঁর সংকল্প।'

বিভিন্ন সূত্রে জানা যায় যে, রবীন্দ্রনাথের 'জাপানের কাছে পত্র' (যা পরে তাঁর 'ন্যাশনালিজম'-এর ফরাশি সংস্করণের অন্তর্ভুক্ত হয়, ১৯২৪) যুদ্ধের সময়, ট্রেঞ্চের মধ্যে সৈন্যরা পড়ত। এই রচনাটি রবীন্দ্রনাথকে ফ্রান্সে এবং য়ুরোপের অন্যতম আলোচিত-ব্যক্তিত্বে পরিণত করে।

রবীন্দ্রনাথের 'দ্যা গার্ডেনার' বইটির উপর একটি আলোচনা প্রকাশিত হয় 'Journal d'Alsace et de Lorraine'-এ। এটি অনুবাদ করেছিলেন Madame Henriette Mirabaud Thorens ; ক্যাম্ব্রিজ থেকে J. L. Anderson লিখেছেন, 'It was rather a pleasant and cheerful review'.

ফরাশি 'গীতাঞ্জলি'র ৩য় কভারে বিজ্ঞাপিত হয়েছে এই বইটি সহ 'লা জ্যন ল্যুন'-এর। তাছাড়া কয়েকটি অনুবাদ গ্রন্থ সম্পর্কে কিছু তথ্য সংযোজন করা যেতে পারে। যথা: 'বলাকা' অনুবাদ করেছিলেন ফরাশি কবি পিয়ের জঁ জুভ্ ও কালিদাস নাগ (১৯২৩)। অন্যান্য

অনুবাদের মধ্যে উল্লেখ্য হলো 'চার অধ্যায়', মাদলেন রল্যাঁ কৃত, (রম্যাঁ রল্যাঁ-র ভূমিকা সমেত) (১৯২৫)। ২০০৪ সালে প্রকাশিত এটির নতুন অনুবাদ ড. ফ্রাঁস ভট্টাচার্যের কৃতিত্ব। 'গোরা'-র অনুবাদ মার্গারিত গ্লোদস-এর, তবে নতুন সংস্করণ পিয়ের ফালোঁ কর্তৃক সংশোধিত (২০০২)। মাদমোয়াজেল ক্রিসতিন বসনেক (১৯৩৫ থেকে ১৯৪০, ৫ বছর শান্তিনিকেতনে কর্মরত ছিলেন) ড. কমলেশ্বর ভট্টাচার্যের সঙ্গে ছোটগল্পের একটা সংকলন বের করেছিলেন 'ল্য ভাগাবোঁ' (গালিমার, ১৯৬২) নামে এবং রাজেশ্বরী দত্তের সঙ্গে তর্জমা করেছিলেন 'ছেলেবেলা' 'Enfance' শিরোনামে (গালিমার ১৯৬৪)।

ইংরেজি 'গীতাঞ্জলি'র অনুবাদ সংস্কার-পর্বে য়েটস রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন তরুণী ইজল্ট গন (Iseult Gonne, 1895-1954)-এর সঙ্গে। এক সময় মেয়েটির মার সঙ্গে ছিল তাঁর গাঢ় প্রণয়। কিন্তু মাদাম মড গন (Maud Gonne, 1865-1953) তাঁর বিবাহের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তবে তাঁরা বন্ধু থাকেন এবং মাদামের নরমান্ডি-র (ফ্রান্স) বাড়িতে গ্রীষ্মাবকাশ যাপনের সময় য়েটস 'গীতাঞ্জলি'র ভূমিকা লেখেন। মাদাম গনের পিতা আইরিশ ও মা ইংরেজ এবং নিজে অসামান্যা সুন্দরী অভিনেত্রী ও সমাজকর্মী। য়েটস ইজল্ট সম্পর্কে খুবই উচ্চ প্রশংসার ভঙ্গিতে লেখেন, '...মেয়েটি খুবই সুন্দরী এবং চমৎকার একটি ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী হয়ে উঠছে এখন। ...কোন মেয়ের মধ্যে এত প্রতিভা দেখিনি আগে ...আপনি যদি খুব ব্যস্ত থাকেন, যদি লাঞ্চ বা ডিনারে আসার মত সময় আপনার হাতে না থাকে, তাহলে, আপনি অনুমতি দিলে আমি ইসোল্টকে নিয়ে একদিন বিকেলে আধঘণ্টার জন্য আপনার কাছে আসতে পারি। ভালো লাগবে আপনার। পৃথিবীতে এ রকম সুন্দরী মেয়ে কম আছে, বয়স ১৯, এর মধ্যে ফ্লবেয়ার সমস্ত পড়ে ফেলেছে, এবং শুনছি বাংলা শেখা আরম্ভ

করতে চায়। আমি ওকে ছোটবেলা থেকে জানি...' (সমীর সেনগুপ্ত, পূর্বোক্ত)

ইজল্ট অক্সফোর্ডের ছাত্র এবং 'ডাকঘর'-এর অনুবাদক দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের কাছে বাংলা শিখছিলেন। দু'বছরের মধ্যে 'দ্যা গার্ডেনার'-এর অনেকগুলো কবিতা ফরাশিতে অনুবাদ করেন। অবশ্য অনুবাদগুলো প্রকাশিত হয়েছিলো কিনা জানা যায়নি। কারণ বর্তমানে আমরা ভিন্ন অনুবাদকের নাম পাই।

ফ্রান্সে দ্বিতীয় সফরের সময় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় মাদাম রনে দ্য ব্রিমোঁ-র (Renée de Brimont); তাঁর সঙ্গে ছিলো 'La Fugitive' -এর পাণ্ডুলিপি। আগের বার এসে তিনি রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে অনুমতি গ্রহণ করেছিলেন – অনুবাদ-কর্মটি পরের বছর (১৯২২) প্রকাশিত হয়। এর সঙ্গে যুক্ত থাকে অঁরিয়েত মিরাবো-থরোঁস-এর 'পয়েম দ্য কবির'।

১০ আগস্ট 'দ্যা গার্ডেনার' এর অনুবাদ ('ল্য জার্দিনিয়ে দা'মুর') সহ অধ্যাপক ল্য ব্রাঁ (Le Brun) তাঁর সদ্য-বিবাহিত স্ত্রীকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন কানের অতিথিশালায়। অধ্যাপক গল্প করেন যে, 'রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-আলোচনা কালে তাঁহাদের প্রথম প্রণয় হয়।'

বহু গ্রন্থের লেখক ফিলিসিয়্যাঁ শালে জানিয়েছেন যে, পাশ্চাত্যের আত্মধ্বংসী অমানবিক সভ্যতার বিপরীতে যে-মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ হওয়া প্রয়োজন, রবীন্দ্রনাথ তা-ই প্রাচ্য-পাশ্চাত্য মিলন প্রসঙ্গে এক ভাষণে বলেছিলেন, এটি ছাপা হয়েছে Institut International de Coopération Intellectuelle নামক প্রতিষ্ঠান থেকে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষে রবীন্দ্রনাথ যখন প্যারিসে যান তার আগে ঘটে অমৃতসরে সরকারী নৃশংসতা ও তার প্রতিবাদে কবির নাইট উপাধি ত্যাগ। যুদ্ধমিত্র ইংরেজদের সঙ্গে ফরাশিরা একটা সমস্যা সৃষ্টিতে অনাগ্রহী ছিল। ফলে, 'ফ্রান্সের জ্ঞানী-গুণীরা মিলে রবীন্দ্রনাথের সংবর্ধনার আয়োজন ও ব্যবস্থা করলেও, এই সংবর্ধনার সমস্ত ব্যয়ভার সরকার গ্রহণ করেছিলেন।' (মৈত্রেয়ী দেবী, 'বিশ্বসভায় রবীন্দ্রনাথ')

ফরাশি ভাষায় 'গীতাঞ্জলি' প্রকাশের পর অন্যান্য গ্রন্থ এমন-কি তাঁর রাজনৈতিক মতামত ও মানবতাবাদী অভিমত যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছিল। তাঁর প্রতি বিভিন্ন দলমতের বিদগ্ধজনের অকুণ্ঠ আকর্ষণ লক্ষ্য করা যায়। তিরিশ জনেরও বেশি বিখ্যাত ব্যক্তি তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন। সাধারণ মানুষও তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন। কেমন করে এই অসাধ্য সাধন হলো, তাঁর সান্নিধ্যে-আসা ফরাশি সুজনদের সম্পর্কে সংক্ষেপে জানলেও তার কিছুটা ধারণা করা যাবে। এখানে আমরা ১৯১২ সালে তাঁর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎলাভকারী কবি স্যাঁ-জন পের্স, 'গীতাঞ্জলি'র অনুবাদক অঁদ্রে জিদ ও প্যারিসের সেই বিখ্যাত অতিথিশালার কর্তা আলবের কানের কথা প্রথমে বলব। বস্তুত এঁরা তিনজনই ফরাশি দেশে রবীন্দ্রনাথের ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা রেখেছেন।

লন্ডনের একটি বাড়িতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ, 'গীতাঞ্জলি' অনুবাদের অনুমতি লাভ এবং সামান্য পত্র যোগাযোগ ছাড়া স্যাঁ-জন পের্স দীর্ঘদিন বিচ্ছিন্ন ছিলেন। ১৯৬১ সালে রবীন্দ্রনাথের উপর একটি শ্রদ্ধার্ঘ-রচনা পাঠের মাধ্যমে আমরা তাঁকে পুনরাবিষ্কার করি। তাঁর মননঋদ্ধ অসামান্য রচনাটির একাধিক বঙ্গানুবাদ রয়েছে।

১৯৬০-এর নোবেল বিজয়ী এই কবির রচনার অংশবিশেষ আমরা প্রথম অনুবাদ থেকে এখানে উদ্ধৃত করছি :

> 'ফরাসী চিন্তাধারার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতি উদযাপন – ব্যাপারটি সংযুক্ত করতে চাওয়া হল বিশ্বজনীন মানবতাবোধের উচ্চতম প্রত্যয়ের প্রতি ফরাসীদের অনুরাগকেই স্বীকৃতি দেওয়া।... কালাতীত দেশাতীত তাঁর কবিতা, শাশ্বত-বিমুগ্ধ, খুঁজে ফেরে মানুষেরই পদক্ষেপে পরিচিত উৎসটি আর মেটে ঘাটটি যেখানে নিজেকে নিরাবরণ করে মানুষের রাত্রি। যখন যেখানে গিয়েছেন তিনি, তার সঙ্গে সঙ্গে ফিরেছে এক অনন্ত উপস্থিতি; তেমনি অনন্ত এক আস্পৃহার তাগিদ।
>
> এই ছিল তাঁর সত্তার আর ভালোবাসার মহান পন্থা, সমস্ত তারুণ্যকে আত্মার সমস্ত প্রবীণত্বের সঙ্গে পরিণত করা। কারণ কবিরূপে তাঁর গৌরব ছিল তাঁর কবিতাকেই জীবনে ছন্দিত করা, এবং তারই মধ্যে সর্বাঙ্গীণরূপে বাস করা, তাঁর মানবরূপ এবং জীবরূপ সমস্ত সর্বাঙ্গীণতাকে নিয়েই।
>
> পাশ্চাত্যবাসী আমাদের কাছে এসেছিলেন তিনি 'গীতাঞ্জলি' নিয়ে, যার গীতময় অঞ্জলি আমাদের কাছে এনে দিয়েছিল সর্বপ্রথম অপূর্ব স্নিগ্ধতা আর অপূর্ব আরক, যেন এশিয়ারই বিরাট কোনও বৃক্ষের পত্রনির্যাস। তার সৌরভ তখনো আমোদিত করে রেখেছিল কুশলী অনুবাদকের সূক্ষ্ম এই ইংরেজিতে, যে-অনুবাদক স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই। অতি পবিত্র এক শিল্পের বিকাশ সেখানে, সেই অব্যক্তের মাঝে, এবং যা

সত্তার সর্বোচ্চ লোকে উঠে আত্মারই নানা কথা বলেছে: সমগ্র সত্তার অতি মধুর মূর্ছনা. মিস্টিক এক নিশ্বাসের অনুরূপ।

দূরাগত কণ্ঠ তাঁর আমাদের কাছে অত্যন্ত নিকট মনে হল; তাঁর এশিয়াবাসীর গান আমাদের কানে মনে হল সর্বত্রেরই গান বলে।... আর, কবির জন্মভূমিসুলভ গ্রীষ্মের মৌসুমী বাতাস আমাদের কাছে নিয়ে এল তার স্বাভাবিক কান্না।...

বিদেশীয়ানার চেয়েও বড় যা – অতি মূল্যবান কী-একটা তার মধ্যে পেয়ে ফরাসী কান একাগ্র হল অবিলম্বে: বিশ্ব-আত্মার এক নতুন সঙ্গীত।

অসাময়িক মানবের জন্যে যতই উৎকণ্ঠা থাক না তাঁর, তাঁর সমসাময়িক ইতিহাসের মানুষের জন্যেও কম ব্যাকুল ছিলেন না রবীন্দ্রনাথ। ইউরোপ তাঁর আগমন ধ্যানকে যেমন কর্মকেও তেমনি আহ্বান জানিয়েছিল সেদিন। তার মাঝেই আবার প্রত্যক্ষ রূপে ফুটে উঠে তাঁর স্বদেশপ্রেমের উন্মাদনা; আর-এক বাণীর অধীর অভীপ্সা যা তার পূর্ণ তাৎপর্য পরিগ্রহ করবে ঘটনাধারার আলোকে।

জড়বাদের শোচনীয় পরিণতির কথা ভেবে মানবতার ভবিষ্যৎ নিয়ন্তা শ্রমশিল্প সর্বস্ব এই সভ্যতার কথা ভেবে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। দ্বিমুখী সংকটের কথা তিনি বললেন: সমষ্টিগত মানবতার দিক দিয়ে কোন আর্ন্তজাতিক সমপ্রাণতায় আর ব্যক্তিগত মানুষের দিক দিয়ে, তার সর্বাঙ্গীণতায়।

পরিত্রাণের পথ কোথায়? কোন আশ্রয়ের দিকেই বা ফিরে দাঁড়াব যখন, রবীন্দ্রনাথের মতে একমাত্র লক্ষ্য হল মানব গূঢ়ৈষণার মধ্যে যাকিছু আধ্যাত্মিক, তারই সংরক্ষণ? অ্যাংলো-স্যাক্সন প্রয়োগবাদ তাঁকে দিল না বড় একটা ভরসা। ফরাসী যুক্তিপ্রিয়তার প্রতিও তাঁর কম অনাস্থা ছিল না, যেখানে কিন্তু তাঁর চোখে পড়ে নি মানুষের তাগিদেরই চরম এক রূপ। কিন্তু তিনি জানতেন কত নীতিবিদ আর কত-না মানবতা-প্রেমিকের দীর্ঘ ঐতিহ্যে পুষ্ট হয়ে এসেছে ফরাসী আত্মা, কী স্বতঃস্ফূর্ত উদারনীতিতেই না গড়া ফরাসী সমাজ, এবং ফরাসী ব্যক্তির অন্তরের একাংশ কত সহজেই না সাড়া দেয় বিশ্বজনীন ব্যক্তির সুখেদুঃখে। এবং তিনি শ্রদ্ধা পোষণ করতেন ভারতজ্ঞ ফরাসী পণ্ডিতদের মানবতাবোধ এবং উদারচেতনার প্রতি।

রবীন্দ্রনাথ চাইলেন ফরাসী সাহিত্য-মহলে প্রথম প্রবেশের নিশ্চয়তা। আমি তাঁকে দিতে পারলাম আঁদ্রে জিদের প্রীতিপূর্ণ সহায়তা, যে-জিদের ভূমিকা, অনুবাদক-রূপে, এডগার অ্যালেন পো-র ফরাসী অনুবাদক বোদলেয়ার কিংবা গ্যেটের অনুবাদক জেরার দ্য ন্যার্ভালের চেয়ে কোনো অংশে কম কৃতিত্বপূর্ণ নয়।

তাঁর প্রয়াণের বহুদিন পরে, এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পুঞ্জীভূত ধ্বংসাবশেষের পাশে দাঁড়িয়ে, নবীসুলভ এই কণ্ঠের মাহাত্ম্যের পরিমাপ নিতে গিয়ে আমরা নীরবতার মাঝে সূচিত করতে পারি আবার রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমাদের আলোচনার অসম্পূর্ণ সূত্র।

পাশ্চাত্য মানবের সঙ্গে এশিয়ার এই যে সম্মিলন আমরা তা থামতে দেব না। কবি রবীন্দ্রনাথ আজো যে বেঁচে আছেন। ফ্রান্সের যা কিছু তিনি ভালোবাসতেন, সবই আজ আবার উপস্থাপিত তাঁর স্মরণে।' (পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় অনূদিত 'ফরাসীদের চোখে রবীন্দ্রনাথ')

ফরাশি মূল টেক্স্ট HOMMAGE A LA MEMOIRE DE RABINDRANATH TAGORE; MESSAGE DE SAINT-JOHN PERSE ; 'HOMMAGE DE LA FRANCE A RABINDRANATH TAGORE' ; PARIS: INSTITUT DE CIVILISATION INDIENNE, 1962) ।

১৯২১ সালে প্যারিসে অবস্থানকালে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় অঁদ্রে জিদ-এর, কিন্তু রথীন্দ্রনাথের বর্ণনায় জানা যায় জিদ-এর সঙ্গে 'জমেনি', কেননা জিদ নাকি 'লাজুক'। তাই কথাবার্তা বেশি এগোয় নি। আমাদের ধারণা, বই পড়া ইংরেজি পর্যাপ্ত আয়ত্ত করলেও জিদ বলা- কওয়ায় হয়ত তত লায়েক ছিলেন না। বিগত শতাব্দীর ষাটের দশকেও বহু প্রবীণ ফরাশিকে দেখেছি, ইংরেজি জানেন না। জানলেও বলতে পারেন না। অর্থাৎ তাঁরা কেবল বই পড়ে বুঝতে পারেন। তা না হলে বহু গ্রন্থ রচয়িতা, প্রখ্যাত সাহিত্য সাময়িকীর প্রতিষ্ঠাতা, স্বনামধন্য লেখক-বুদ্ধিজীবী জিদ লাজুক হয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ভাব-বিনিময়ে অসমর্থ হবেন, এটা ভাবা যায় না। অবশ্য পরবর্তীকালে ভিক্তোরিয়া ওকাম্পোও প্রায় একই অনুযোগ করেছেন – রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জিদ-এর সংলাপ যেন এগুচ্ছে না।

কিন্তু এ সময়ে প্রাপ্ত জিদ-এর বইয়ের প্রশংসাসূত্রে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পত্রে লিখছেন যে, য়ুরোপ ছেড়ে যাবার আগে তিনি আশা করেন জিদ-এর সঙ্গে তাঁর আবার সাক্ষাৎ হবে। তাছাড়া তাঁর চিত্রপ্রদর্শনীর কাটালগের জন্য একটি ভূমিকা জিদ লিখবেন, এ রকম প্রস্তাব উত্থাপিত

হয়েছিলো। কিন্তু পরদিন জার্মানি যাবার কারণে জিদকে অব্যাহতি দেয়া হলো এবং সে দায়িত্ব অর্পিত হলো কোঁতেস আনা দো নোয়াই-র ওপর।

এখানে পুনঃউল্লেখ করা প্রয়োজন যে, সে সময়ে ফ্রান্সে জিদ ছিলেন অত্যন্ত প্রভাবশালী সাহিত্যিক, তাছাড়া তাঁর অনূদিত 'গীতাঞ্জলি' ও 'ডাকঘর' অতি উচ্চ শ্রেণির সাহিত্যকর্মরূপে বিবেচিত। তাঁর কবিত্বপূর্ণ গদ্য প্রকৃতিপ্রেম ও মানবতার সমন্বয়ে আশ্চর্য রকম বিকশিত। বহু খণ্ডে প্রকাশিত 'জুর্নাল'ও বহুলপঠিত সাহিত্যসম্ভার।

পের্স, জিদ-এর পর যাঁর নাম সবচেয়ে বেশি স্মরণযোগ্য তিনি হলেন আলবের কান। ২৫ এপ্রিল ১৯২১ রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রতিষ্ঠানে 'A Discourse on the Public Spirit in India' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। কান সেকালেই চলচ্চিত্রের প্রতি ঝুঁকেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের প্রথম বিমান ভ্রমণের দৃশ্য এবং তাঁর অসাধারণ বাগানে ভ্রমণরত ছবি তাঁর সূত্রে লভ্য। পরবর্তীকালে তিনি 'যুদ্ধ ও শান্তি' নামে একটি ছবি নির্মাণ করেন। ছবিটি দেখে রবীন্দ্রনাথ অবশ্য ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন যে, প্রথম মহাযুদ্ধে ফ্রান্সেই কয়েক লক্ষ ভারতীয় আত্মত্যাগ করলেও তাঁদের উল্লেখ এই ছবিতে নেই। ১৯২৯ সালের অর্থনৈতিক মন্দা কানকে দেউলিয়া করে দেয়। শোনা যায়, তাঁর সম্পত্তি সরকার দখল করে নেয়।

আলবের কান-এর শিক্ষক এবং বন্ধু অঁরি বের্গসোঁ (Henri-Louis Bergson,1857-1941, Nobel Laureate, 1927) ২৪ অগস্ট ১৯২০ প্রথমবার রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন। মা স্কটিশ, তাই ইংরেজি জানা বের্গসোঁর সঙ্গে কবির সুবিধাই হয়েছে। ২৩ এপ্রিল, ১৯২৯ অপরাহ্নে বের্গসোঁ আবার আসেন ওতুর দ্য মোঁদ্-এ। ডিনারে

আপ্যায়িত করে দীর্ঘ সময় ধরে তাঁদের মধ্যে চলে প্রচুর আলোচনা। বের্গসোঁর চিন্তাধারা রবীন্দ্রনাথের ওপর যে প্রভাব বিস্তার করেছে, তা বোঝা যায় বিভিন্ন সূত্রে। এক পর্যায়ে দুজনের দার্শনিক মতবাদের মধ্যে বেশ কিছু মিল ছিল। রবীন্দ্রনাথের কবি-জীবনে 'বলাকা' পর্ব তার নিদর্শন। ১৯২১ সালে বের্গসোঁর সঙ্গে কবির সাক্ষাতের অনুলিপি যিনি তৈরি করেছিলেন, তিনি লিখেছেন যে, 'বার্গসঁর কথাগুলি লিখলাম কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কথাগুলি ভালো করে লিখতে পারিনি। তাঁর ভাষা ভাবের এমনি বিশেষত্ব যে তা রক্ষা করা কঠিন।' এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের একটা বক্তব্য আছে:

> 'আজ পর্যন্ত আমার বক্তৃতার রিপোর্ট ঠিকমত হলোই না – নিজের গান আমাকে শুনতে হবে দলিত অবস্থায়, নিজের কথা আমায় পড়তে হবে বিকৃত ভাষায়। এ আমার ললাটের লিখন, আমি জানি এ সম্বন্ধে আমার নিজের ভাষা ও ভঙ্গি আমার প্রধান শত্রু।' (মৈত্রেয়ী দেবী কর্তৃক উদ্ধৃত)

তবে বের্গসোঁ নিজেও নাকি তাঁকে না দেখিয়ে তাঁর বক্তব্য প্রকাশে অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ভয়ানক তুষ্ট। তিনি বন্ধু সি.এফ.এন্ডরুজকে জানিয়েছিলেন যে,

> 'মহাদার্শনিক বার্গসঁ আমার সঙ্গে সাক্ষাত করতে এসেছিলেন। তিনি আমার বই 'পার্সোনালিটি' পড়েছেন। এবং সে বই সম্বন্ধে তিনি যে রকম প্রশংসা করলেন তা আমার আশার অতীত।'

দুই মহারথীর মতবাদের অন্তর্নিহিত তত্ত্বের গভীরত্বের দিকে দৃষ্টি রেখে আমরা সামান্য উদ্ধৃতি দেব। বের্গসোঁর বক্তব্য: 'ভারতীয় চিন্তাধারার সঙ্গে ইয়োরোপীয় চিন্তাধারার প্রধান পার্থক্য এই যে ইয়োরোপীয় মন

more precise এবং ভারতীয় মন more intuitive । প্রকৃতিকে জয় করবার উদ্দেশ্যে বস্তুজগতের সঙ্গে সম্পর্কে নিয়ত কর্মনিরত থাকায় মনের এই যাথাযথ ঘটেছে, যার প্রয়োজন গভীর। কিন্তু এও সত্য যে এই খুঁটিয়ে দেখাই চরম দেখা নয় – আধ্যাত্মিক অনুভবে উৎক্রান্ত হওয়াতেই সকল বুদ্ধির শেষ পরিণতি। ...নিজের বিষয়ে তিনি বলেছিলেন যে, তাঁর দার্শনিক মতবাদটি এখন আবার পরিবর্তিত করে নূতনভাবে লিখছেন – কিন্তু এই মতবাদে তিনি ঘোরা পথে এসে পৌঁছেন – অর্থাৎ যেমন নানা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হয়েছে তারই সাহায্যে গড়ে তুলেছেন তাঁর তত্ত্বচিন্তা। এই কথা বলে তিনি কবির দিকে দৃষ্টিপাত করে বলেছিলেন, 'কিন্তু আমার মনে হয় তুমি তোমার 'সাধনা' ও 'পার্সনালিটি'তে যে মত প্রকাশ করেছ তা অমন ঘোরা পথে পাওনি, তোমার কাছে সে সত্য একেবারে ধ্যানলব্ধ প্রত্যক্ষবৎ এসেছে। ভারতবর্ষীয় চিত্তের এই দিকের শক্তি আমার কাছে বিশেষ প্রবল মনে হয়।"

রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের কিছু অংশ ছিল এরকম : 'মানুষের তো আত্মা আছে, মানুষ তো কেবল একটা টাকার বস্তা নয়, যে মুনাফা থেকে মুনাফান্তরে লম্ফ দিয়ে দিয়ে অন্য মানুষের মেরুদণ্ড ভেঙে চলাতেই সার্থকতা হবে।' ...কবি বর্তমানে বণিকবৃত্ত সভ্যতার কবলে পড়ে গঙ্গার দুই উপকূলের চটকলের চিমনির ধূম্র-মলিন অবস্থার সঙ্গে তাঁদের বাল্যকালের গঙ্গাতীরে স্বচ্ছ নির্মল সৌন্দর্যের তুলনা করেন। কলকাতায় গঙ্গা আছে অথচ গঙ্গার শোভা নেই, ব্যবসায়ী বৃত্তের কবলগ্রস্ত তার সৌন্দর্য – কবি কৌতুক করে বলছেন, তোমরা হয়ত জান কলকাতা এক upstsart শহর... । এর উৎপত্তি সম্বন্ধে বলা যায়, প্রথমে ছিল দোকানের আত্মা, সে মেগাফোনের ভিতর দিয়ে ঘোষণা

করলে 'অফিস হোক' (let there be office), অমনি জন্মালো কলকাতা।' (মৈত্রেয়ী দেবী কর্তৃক উদ্ধৃত)

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সবচে' দীর্ঘস্থায়ী ও ফলপ্রসূ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল সম্ভবত প্রাচ্যতত্ত্ববিদ সিলভ্যাঁ লেভির সঙ্গে। তিনি প্রথম ভারতে আসেন ১৮৯৭ সালে। তাঁর তিন খণ্ডে রচিত নেপালের ইতিবৃত্ত ('Le Népal') খুবই বিখ্যাত। ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ঐ গ্রন্থের ভিত্তিতে চর্যাপদের কালক্রম নির্ধারণ করেন। ১৯১৩ সালে ১৬ ডিসেম্বর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সিলভ্যাঁ লেভি এবং দুজন জার্মান পণ্ডিতকে ডি লিট উপাধিতে ভূষিত করেন। রবীন্দ্রনাথের প্যারিস অবস্থান কালে তাঁরা দুজন ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করেন। লেভি স্ত্রাসবুর্গে কিছুকাল কর্মরত হলে কবিকে আমন্ত্রণ জানিয়ে সেখানে বিপুল সম্বর্ধনা দেন। বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠালগ্নে প্রথম অভ্যাগত অধ্যাপক তথা ভিজিটিং প্রফেসর রূপে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে আমন্ত্রণ জানান। সৌভাগ্যক্রমে লেভি তা গ্রহণ করেন এবং সস্ত্রীক ১০ নভেম্বর ১৯২১ তারিখে শান্তিনিকেতন আগমন করেন। প্রতি রোববার তিনি প্রাচীন ভারতের সঙ্গে বহির্জগতের সম্পর্কের ইতিহাস বিষয়ে বক্তৃতা করতেন ইংরেজিতে। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং উপস্থিত থেকে নোট নিতেন এবং বাংলায় সমাপনী বক্তব্য উপস্থাপন করতেন। এক পর্যায়ে লেভি তাঁর কাছ থেকে বাংলা শিখতে শুরু করেন। সপ্তাহের অন্যান্য দিন লেভি আলাদাভাবে চীনা ও তিব্বতি ভাষার ক্লাস নিতেন। অন্য দিকে মাদাম দেজিরে লেভি (Madame Désirée Lévi) ফরাশি পড়াতেন। তাঁর অনুপম ব্যক্তিত্বের মাধুর্যে তখন শান্তিনিকেতন ছিল মুগ্ধ। পরবর্তী কালে তাঁর ডায়েরিসূত্রে আমরা সেকালের বহু তথ্য অবগত হই।

মাঝখানে লেভি দম্পতি নেপাল যাবার সিদ্ধান্ত নিলে রবীন্দ্রনাথও সহযাত্রী হতে চাইলেন। কিন্তু স্বাস্থ্যগত কারণে আত্মীয়-অনুরাগীদের নিষেধ মেনে তিনি আর যান নি। তাঁদের বিদায় উপলক্ষে শান্তিনিকেতনে ও কলকাতায় খুবই মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শান্তিনিকেতনে বক্তৃতায় লেভি বিশ্বভারতীর শিক্ষার তারিফ করেন এবং তাঁর বিদায়-বেদনার কথা বলেন। কলকাতায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর বক্তৃতায় উল্লেখ করেন যে, লেভির মতো 'একাধারে বিশ্ববিশ্রুত পণ্ডিত এবং স্নেহ, ভালবাসা ও সদাশয়তায় পূর্ণ মনোমুগ্ধকর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এক মানুষকে পেয়ে তিনি যারপরনাই আনন্দিত।' রবীন্দ্রনাথ অবশ্য কিছু পরে লেভির সঙ্গে বোম্বাই থেকে পুনা ও ব্যাঙ্গালোরে বক্তৃতা অনুষ্ঠানে যান। এক সময়ে দুজনের মধ্যে কিছু ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। এ পর্যায়ে লেভি তাঁকে এক পত্রে লেখেন, 'আমি কি আমার স্ত্রীর প্রকাশ করা বইটি আপনাকে পড়ে দেখতে অনুরোধ করব, যার জন্য পুরোনো বন্ধুরা তাঁকে ক্ষেপান তিনি আপনার প্রেমে পড়েছেন বলে ?' অন্যদিকে মাদাম লেভি রবীন্দ্রনাথের অনাড়ম্বর অবস্থান সম্পর্কে লিখেছেন, 'তিনি বিশ্ব-বিবেকের অন্যতম মুখপাত্র, খুব কম মানুষই তাঁর মতো প্রতিপত্তি অর্জন করেছে।' বহু পরে জাপান থেকে ফেরার পরে লেভি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁদের ভুল বোঝাবুঝির দুঃস্বপ্ন থেকে অব্যাহতি লাভের প্রয়াস পেয়েছিলেন। প্রসঙ্গত ব্রিটিশ সরকারের একটি গোপনীয় রিপোর্টের তথ্য এখানে পরিবেশন করা যায়: '...ফরাসী ইহুদী সিলভ্যাঁ লেভির মতিগতি যে নৈরাজ্যবাদী তাহা সর্বজনবিদিত।' (সমীর সেনগুপ্ত, 'রবীন্দ্রসূত্রে বিদেশীরা')

লেভি মারা যান ৬ নভেম্বর ১৯৩৫। এর পরদিন রবীন্দ্রনাথ এই খবর পান কিন্তু তার আগের দিন লেখেন 'দেহাতীত' কবিতাটি ('পত্রপুট', ১০/ 'প্রবাসী', চৈত্র ১৩৪২)। সিলভ্যাঁ লেভির মৃত্যু 'এই সংবাদের

সঙ্গে কবির দেহাতীত ভাবনার কোন যোগ আছে কিনা তাহা বিবেচ্য' (প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, 'রবীন্দ্রজীবনী', ৩৭:৪, টীকা ৫ চতুর্থ সংস্করণ, ১৪১৭)।

লেভির উত্তরসূরি কয়েকজন ফরাশি বিশ্ববিদ্যালয়-ব্যক্তিত্বের প্রসঙ্গ এখানে তুলে ধরবো। প্রথমত জ্যুল ব্লক-এর (Jules Bloch) কথা বলা যায়। লেভিসহ কানের অতিথিশালায় রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ-প্রার্থী হন, ১৯২০-এ। ব্লক মারাঠি ভাষার গঠন-প্রকৃতি নিয়ে অভিসন্দর্ভ রচনা করেছেন যা পরবর্তীকালে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। সুনীতি চট্টোপাধ্যায় এ ব্যাপারে তাঁর পরোক্ষ ছাত্র হয়ে যান। অন্য দিকে, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ প্রত্যক্ষভাবে তাঁর তত্ত্বাবধানে চর্যাপদ, দোহাকোষ ও বিলম্বিত বৌদ্ধধর্ম বিষয়ে গবেষণা করেন। ব্লক ভালো বাংলা জানতেন। মুহম্মদ এনামুল হকের ডক্টরেট ডিগ্রির অভিসন্দর্ভের অন্যতম পরীক্ষক তিনি। সাহিত্যের বিশ্বকোষ (গালিমার, ১ম খণ্ড) গ্রন্থে তিনি বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে একটা চমৎকার প্রবন্ধ লিখেছেন। তাতে রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে তাঁর অনেক তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন মন্তব্য রয়েছে।

লেভি, ব্লক প্রমুখের উত্তরসূরি ১৯৫০-১৯৬০-এর দশকে সবচেয়ে স্বনামধন্য সংস্কৃতজ্ঞ ও প্রাচ্যতত্ত্ববিদ অধ্যাপক লুই রনু সম্ভবত রবীন্দ্রনাথকে দেখেছিলেন। তাঁর তুলনামূলকভাবে ছোট্ট বই 'ভারতের সাহিত্যসমূহ' গ্রন্থে রনু সারগর্ভ আলোচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথের ওপর। আমরা একটি অনুচ্ছেদ এখানে তুলে ধরব: 'তাঁর সমগ্র সাহিত্যসাধনা কিপলিঙ-এর "পশ্চিম ও পূর্ব কখনো একত্র হবেনা" কথাকে মিথ্যা প্রমাণ করবার জন্য যথেষ্ট। বিপরীতে তিনি বিশ্বাস করেন এর মিলন, প্রতিষ্ঠা করেন সংস্কৃতির পটভূমিতে, আধ্যাত্মিকতার মর্মে অথচ কোনো প্রাতিষ্ঠানিক বিশ্বাসের অঙ্গীভূত না হয়ে এবং

প্রকৃতির জীবন্ত শক্তি ও ভারতীয় ঐতিহ্যসমূহ থেকে রস আহরণ করে। এটাকে তিনি এমন এক মিশনে পরিণত করেছিলেন যাকে চূড়ান্ত রূপ দিতে তিনি ছিলেন অনড়।'

'রবীন্দ্রনাথ ও ফ্রান্স' শীর্ষক ভিন্ন প্রবন্ধে রনু অনেক নতুন তথ্য দিয়েছেন : ১৯২০ সালে লুই জিলে নাকি লিখেছিলেন সমসাময়িক চিন্তাধারার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ টলস্টয়ের আসনে অধিষ্ঠিত। তাছাড়া 'ঘরে-বাইরে' একটি সুন্দর উপন্যাস এবং আলবের থিবোদে-র প্রশংসাধন্য ; তাঁর মতে :

'ফর্মের সূক্ষ্ম সৌন্দর্যের মোহে, স্টাইলগত বহু কষ্ট-কল্পনার ধারায়, শেষ হয়ে-আসা দাদা-প্রভাব এবং শুরু হতে-থাকা স্যুররেয়ালিস্ত আকর্ষণে অবসাদগ্রস্ত যে কবিতা-পাঠক তখন পাশ্চাত্যের নৈতিক মূল্যবোধের দারুণ অবক্ষয়ের মুখোমুখি, রবীন্দ্রনাথ তাঁদের জন্য নিয়ে এলেন এক পূত-পবিত্র সুবাতাস। প্রকৃতির সঙ্গে সুস্থ ও প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপন, উৎস থেকে প্রাপ্ত তাঁর প্রেরণা সুদীর্ঘ ঐতিহ্য সূত্রে লব্ধ বহুল ব্যবহৃত শতাব্দীকে দিল এক সরল মহিমান্বিত মাহাত্ম্য। পরে কিছু সমালোচনা দেখা দিল যা জ্যুল ব্লক তুলে ধরলেন– "অনেক বেশি পরিমাণে প্রস্ফুটিত পুষ্পবলয়, পূর্ণিমা রজনী, আলো, বাঁশি নৃত্য আর অশ্রুজলের আধিক্য।" এটা ছিল মাত্রাতিরিক্ত সৃজনশীলতার কুফল। কিন্তু সে সময়ের বিশ্বলোকের নতুন প্রজন্মের মনঃপূত ছিল এই কল্পনা-প্রসূত চিত্রকল্প। লামার্তিন ও ভিক্তর য়্যাগোর পছন্দসই কসমিক ধারণা তাঁর মধ্য দিয়ে ফিরে পাওয়া গেল। তাছাড়া শাশ্বত ভারতবর্ষের প্রতিনিধিরূপে তিনি ছিলেন প্রশংসিত। তাঁকে মনে করা হোত মিস্টিক তথা মরমী। হয়ত তাও তিনি ছিলেন, কিন্তু প্রথমত তিনি জীবন ঘনিষ্ঠ। তাঁর মরমীবাদ ছিল প্রধানত প্রকৃতিপ্রেমজাত। জ্যুল ব্লকও তা

অনুমোদন করেন। বস্তুত রবীন্দ্রনাথ কখনো আদ্যোপান্ত বিচ্ছিন্নতায় বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি কোনো গজদন্ত মিনারের অধিবাসীও নন।'

উল্লেখ্য যে, ১৯৬১ সালে প্যারিসে রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষ উদযাপনের জাতীয় কমিটিতে অধ্যাপক রনু ছিলেন কার্যকরী সমিতির সভাপতি। ১৯৫৯-'৬৫ সালে তিনি ছিলেন বর্তমান লেখকের গবেষণা-পরিচালক। তাছাড়া, তাঁর তত্ত্বাবধানে রীতা শীল ডক্টরেট করেছেন, 'শিক্ষা প্রসারক রবীন্দ্রনাথ' বিষয়ে।

রম্যাঁ রল্যাঁ-র সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ ছিল বহু প্রতীক্ষিত এবং বুদ্ধিবৃত্তিক তাৎপর্যের দিক থেকে অত্যন্ত ফলপ্রসূ। লন্ডনে ২৯ জুন থেকে ২২ জুলাই (১৯১৩) রবীন্দ্রনাথ যখন অর্শ রোগের জন্য একটি নার্সিং হোমে চিকিৎসারত তখন তিনি রল্যাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'জঁ ক্রিস্তফ' পাঠ করেন। বইটি তাঁকে কিছু বিষয়ে গভীরভাবে ভাবিয়ে তুলেছিল। তাঁর প্রথম জীবনীকার আর্নেস্ট রিজ-এর সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি তা উত্থাপন করেন। রিজ তাঁর গ্রন্থে সংগীতজ্ঞ ক্রিস্তফের আত্মার ক্রন্দন নিয়ে রবীন্দ্রনাথের উদ্‌বেগের কথা লিখেছেন।

প্রথম দিকে প্যারিসে গিয়ে রল্যাঁ-র সঙ্গে আলাপের ইচ্ছা প্রকাশ করলেই রবীন্দ্রনাথের ফরাশি বন্ধুরা নাকি চুপ করে যেতেন। আসলে পরাজিত জার্মানীর প্রতি তাঁর সহানুভূতির কারণে রল্যাঁ তখন ফরাশিদের কাছে অবাঞ্ছিত ব্যক্তি। অনেক চেষ্টার পর রথীন্দ্রনাথ ঠিকানা সংগ্রহ করে রল্যাঁ-র সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। কিন্তু তিনি বিন্দুমাত্র ইংরেজি জানতেন না বলে তাঁর সঙ্গে আলাপ সম্ভব হয়নি।

১৯ এপ্রিল ১৯২১ রল্যাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বহু প্রত্যাশিত সাক্ষাৎকারটি সম্ভব হলো। প্রথম দেখার অভিজ্ঞতা রল্যাঁ খুব সুন্দর ভাবে বর্ণনা করেছেন:

> 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এসেছেন দেখা করতে, সঙ্গে তাঁর ছেলে।... পরনে ভারতীয় বেশ, কালো ভেলভেটের উঁচু টুপি আর ছাই রঙের এক লম্বা জোব্বা। তিনি খুবই সুন্দর, প্রায় অতিমাত্রায় সুন্দর - লম্বা, মুখখানা সুন্দর সুষম খাঁটি আর্যজনোচিত। কিন্তু সেই টকটকে রঙের যা সোনালী রৌদ্রমাখা জীবনের গান; উজ্জ্বল বাদামী দুই চোখ - তাতে সুন্দর চোখের হাসিমুখ রেশমের মতো দাড়ি। তিন ভাগে সূঁচলো, দুই সাদা ভাগের মাঝের ভাগ এখনো কালো। এক প্রচুর ও প্রশান্ত আনন্দ গোটামুখ থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে, তা প্রকাশিত হয়ে উঠেছে তাঁর প্রতিটি কথায়। তিনি শুধু ইংরেজিতে প্রকাশ করতে পারেন। আমার দোভাষীর কাজ চালালেন আমার বোন। তাঁর চেহারা অনেকটা সেই প্রাচ্য ঋষির মতো। আনন্দের বিষয়, তাঁর হাবভাব সহজ এবং শালীন। তিনি যা বলেন তা হৃদয়গ্রাহী এবং স্বতঃস্ফূর্ত। তিনি দেড় ঘণ্টা রইলেন হাস্যময় ও বুদ্ধিদীপ্ত সাবলীলতায়, মাঝে মাঝে চিত্রময় বাগ্‌ভঙ্গিতে অনেক কথা বললেন। (অবন্তীকুমার সান্যাল অনূদিত)

বিশ্বশান্তি, প্রাচ্য-পাশ্চাত্যে মিলনের সমস্যা, গান্ধীজির উপর টলস্টয়ের প্রভাব, সংগীত প্রভৃতি বিষয়ে প্রচুর আলোচনা হলো। বিবিধ সাক্ষাতে রল্যাঁ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সমসাময়িক ভারতের রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করতেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে জানালেন যে, খেলাফত আন্দোলন, অসহযোগ তথা চরকা কেটে এক বৎসরের মধ্যে স্বরাজ লাভ বিষয়ে গান্ধীর ঘোষণা তিনি পছন্দ করেন নি। রল্যাঁ প্রতিটি খুঁটিনাটি তথ্য তাঁর দিনপঞ্জিতে টুকেছিলেন, যা আমরা বাংলা অনুবাদে পাই।

২১শে এপ্রিল রবীন্দ্রনাথের নিমন্ত্রণে রল্যাঁ ও তাঁর বোন মধ্যাহ্ন ভোজনে আসেন। পরে রল্যাঁ লেখেন তাঁর অভিজ্ঞতার কথা : 'বিশ্বভারতীর উদ্দেশ্য তথা এশিয়ার বিভিন্ন সংস্কৃতিকে (সেমেটিক,

আর্য, মোঙ্গল প্রভৃতি) পুনর্নির্মিত করা ও তাদের একটা সমন্বয় ঘটানো, এরই সঙ্গে যুক্ত করা পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতিকে যা সৃষ্টি করেছে নবতর বিজ্ঞান, দর্শন ও শিল্প হল তাঁর মূল বক্তব্য। তিনি আমাদের তাঁর দুটো গান শোনালেন। এগুলো 'গীতাঞ্জলি'র কবিতা। আমাদের আগেই জানিয়ে দিলেন যে, এগুলো রীতিসিদ্ধ রচনা নয়, কেননা ভারতীয় সংগীতে তিনি প্রাচীনপন্থী নন। সে-দুটি অত্যন্ত পরিচ্ছন্নভাবে রচিত এবং তাল লয় সমন্বিত, ইউরোপীয় সুরগুলোর খুবই কাছাকাছি, সবকিছু বিচার করলে খুব আগ্রহোদ্দীপক নয়, কিন্তু একে ধরে রাখা এবং লোকসংগীতের ঢংয়ে হয়ত বদল করা সোজা। ...তিনি গান করলেন বসে বসে পা দিয়ে তাল রেখে। তিনি বললেন গীতাঞ্জলির সমস্ত কবিতাতেই গানের সুর বসিয়েছেন। তাঁর সমস্ত কবিতাই এরকমের। আমার প্রশ্নের উত্তরে বললেন প্রায়ই তিনি আগে কবিতা লেখেন কিন্তু কোন কোন সময় আগে আসে গানের সুর এবং তার পরে ভাবে-উদ্বুদ্ধ কথাগুলো বসান। ...আমি রবীন্দ্রনাথের হাতে আমার 'ক্লেরাবো' ও 'আঁপেদ ক্লো' দিলাম।' (ঐ, রলাঁ রচিত গ্রন্থ-তালিকার মধ্যে আমরা 'আঁপেদ ক্লো' ও 'ক্লেরাবো' বই দুটির নাম পেলাম না)।

রলাঁ ২২শে এপ্রিল বিশ্বভারতীর ব্যাপারে সর্বাঙ্গীণ সাহায্যের প্রতিশ্রুতির আশ্বাস দেন। সম্ভব হলে তিনি নিজেই হয়ত শান্তিনিকেতনে যেতেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কিছু সময় কাটানো তাঁর জন্য সবচে' মূল্যবান স্মৃতি হয়ে থাকবে। জবাবে রবীন্দ্রনাথ অন্য সুবচনের পর জানান যে, শান্তিনিকেতনে ফরাশি ভাষা শেখার ক্লাস চালু হয়েছে। ছাত্ররা উৎসাহের সঙ্গে এই ভাষা শিখছে। কাজেই তিনি গেলে অদূর ভবিষ্যতে তাঁর বাণী অবোধ্য থাকবে না। তিনি নিজেও ঠিক করে ফেলেছেন দেশে ফিরে তিনি ফরাশি ভাষা শেখার জন্য কিছু সময় বরাদ্দ করে রাখবেন।

এরপর সুইজারল্যান্ডে যাবার ব্যাপারে রলাঁ-র সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ অব্যাহত থাকে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ৩১ জানুয়ারি, ১৯২৩ বিশ্বভারতী সম্মিলন সাধারণ অধিবেশনে সুইস অধ্যাপক বনোয়া রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে রম্যাঁ রলাঁ সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। এরপর ইটালী ঘুরে রবীন্দ্রনাথ রলাঁ-র কাছে গেলে রলাঁ কবিকে বুঝিয়ে দিলেন যে, ফ্যাসিস্ট-প্রীতি, মুসোলিনী-প্রশস্তি করে কবি কাজটি আদৌ ভালো করেননি। জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় দীর্ঘদিন রবীন্দ্রনাথকে খুব কাছে থেকে জানতেন তাই এ বিষয়ে মন্তব্য করেছেন, 'কবির মোহ ভাঙলো। কবির মন মোহাচ্ছন্ন হতে যতক্ষণ মোহমুক্ত হতে তার থেকে বেশিক্ষণ লাগে না। ...ভাগ্যে ভিলেনুভেতে কবির সঙ্গে রোঁলার সাক্ষাত হয়েছিল এবং সময়মত তাঁর আসল মতটা প্রকাশ পেয়েছিলো, নয়তো য়ুরোপীয় মনীষী-সমাজে কবি কী বদনামেরই ভাগী হতেন।'

রম্যাঁ রলাঁ 'The Golden Book of Tagore' (1931) শীর্ষক সংবর্ধনা গ্রন্থে লিখলেন, 'রবীন্দ্রনাথ হচ্ছেন বড় অভিভাবক। এক দুঃসময়ে তিনি তাঁর জনগণের এবং বিশ্ববাসীর শক্তিশালী ও অতন্দ্রপ্রহরী। আত্মার আলোর ও সুরসঙ্গতির জীবন্ত প্রতীক, তিনি যেন এক শাশ্বত সংগীত যা এরিয়েল উন্মত্ত ঢেউপল্লবিত সমুদ্রের ওপরে উঠে তাঁর স্বর্ণনির্মিত হার্পে সুর তোলেন।'

অন্য দিকে রলাঁর ষাটতম জন্মদিবস উপলক্ষ্যে 'অতি যন্ত্রীয়তার বিরুদ্ধে মত প্রকাশের সুযোগ গ্রহণ করে তাঁর জীবন ও সাধনা বিশ্বমানবতার একটি প্রকৃত প্রমাণ', এই মন্তব্য সহ রবীন্দ্রনাথ একটি ইংরেজি রচনা লেখেন ৫ অক্টোবর ১৯২৫। (দ্রষ্টব্য 'Liber Amicorum Romain Rolland', Rotapfel-Verlag, Zurich, 1926.)

এক সময়ে শান্তিনিকেতনে এলেন ফ্রান্সের একজন আইনজ্ঞ, জ্যুরিসপ্রুডেন্স-এর অধ্যাপক অঁরি সোল্যুস। তিনি (৬ ফেব্রুয়ারি ১৯২৪) 'দ্যা পজিশান অব উইমেন ইন ফ্রেঞ্চ সিভিল ল' বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

রল্যাঁ-র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এক খ্যাতিমান ফরাশি লেখকের কথা আমরা এখানে বলবো। রবীন্দ্র-অনুরাগী এই লেখক হলেন অঁরি বার্ব্যুস। প্রথম দিকে তিনি ছিলেন সংবেদনশীল কবি, পরে বাস্তববাদী কথাশিল্পী। প্রথম মহাযুদ্ধে স্বেচ্ছাসেবক-যুদ্ধের ভয়াবহ অভিজ্ঞতা নিয়ে লিখলেন 'জুর্নাল' যা গোঁকুর পুরস্কার পায়। রম্যাঁ রল্যাঁর সঙ্গে মিলিত হয়ে তিনি 'ক্লার্তে' শীর্ষক পত্রিকা প্রকাশ করলেন, যা ষাটের দশকে নবজীবন লাভ করে। এক পর্যায়ে রল্যাঁ-র সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয় এবং তিনি ঘোরতরভাবে রুশভক্ত থেকে যান। ১৯৩৫ সালে তিনি স্টালিনের উপরে গ্রন্থ প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক আমরা তিন পর্যায়ে লক্ষ্য করি। প্রথমবার ১৯১৯ সালে তিনি রল্যাঁর সঙ্গে মিলিত হয়ে 'বুদ্ধিজীবীদের স্বাধীনতা-ইস্তেহার' প্রকাশ করেন এবং ১৯২৭ সালে শান্তির স্বপক্ষে আন্দোলন শুরু করেন এবং 'দি গোল্ডেন বুক ফর পিস' গ্রন্থ প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রনাথ তার জন্যেও একটি রচনা দেন। এর পর বার্ব্যুস ১৯৩৫ সালে প্যারিসে সংস্কৃতির স্বপক্ষে বুদ্ধিজীবীদের এক সম্মেলনের আয়োজন করেন। দুর্ভাগ্যবশত, তিনি মস্কোতে মৃত্যুবরণ করেন এবং সম্মেলনটির অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন উদীয়মান কথাশিল্পী ও বুদ্ধিজীবী অঁদ্রে মালরো। এতে রাশিয়ার প্রতিনিধিস্বরূপ আসেন বরিস পাস্তেরনাক ও আইজাক বাবেল। রবীন্দ্রনাথ এর জন্য একটি বাণী প্রেরণ করেন।

'আকাদেমিসিয়্যাঁ-রূপে যাঁরা ফ্রান্সে প্রসিদ্ধ ও অমর, তাঁরা হলেন আকাদেমি ফ্রঁসেজ- এর ৪০ জন সদস্যের অন্যতম। একবার নির্বাচিত হলে আজীবন সদস্যপদ থাকে তাঁদের। এরকম একজন অসাধারণ কথাশিল্পী ও জীবনীলেখক অঁদ্রে মোরোয়া ওরফে এমিল হেরজগ। ১৯৬১ সালে তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রম্যাঁ রল্যাঁর সম্পর্ক নিয়ে একটি সুন্দর ছোট প্রবন্ধ লিখেছেন। রল্যাঁ রবীন্দ্রনাথকে প্লেটো এবং গান্ধীকে স্যাঁ পল-এর সঙ্গে তুলনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভ্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে মোরোয়া-র মন্তব্য তাৎপর্যবহ: 'রবীন্দ্রনাথ স্বজন বলতে সবাইকেই হারিয়েছিলেন। কলকাতা তাঁর কাছে মরুবৎ বোধ হত। যশস্বী এই জীবনের শেষ পর্যায় বড়ই শোচনীয় হত যদি তিনি ছবি আঁকার মধ্যে ডুবে না থাকতেন ।' (পৃথ্বীন্দ্র মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত)।

আকাদেমি ফ্রঁসেজ-এর আরেকজন সদস্য অতি সম্মানিত সাংবাদিক-সাহিত্যিক জঁ গেয়েনো একাধিক প্রবন্ধে রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। ১৯১৭ সালে যুদ্ধরত, ট্রেঞ্চ থেকে ফিরছেন, তখন রবীন্দ্রনাথের 'জাপানের কাছে পত্র' তাঁর হাতে পড়ে। পরে তিনি লেখেন : 'কাব্যরসঘন এই পুস্তিকায় আমি পেয়েছিলাম সর্বাধিক মর্মস্পর্শী এক বিশ্লেষণ, যে-ব্যাধিতে ভুগতে ভুগতে ইউরোপ, এমন কি গোটা জগৎই মৃত্যুর পানে দ্রুত এগিয়ে চলেছে সেই ব্যাধিরই বিশ্লেষণ : রবীন্দ্রনাথের মতেই একমত হলেন রম্যাঁ রল্যাঁ।' ১৯২০ সালে তিনি 'প্রাচ্যের বাণী : রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। আর ১৯৬১ সালে লেখেন 'নতুন আশার জনক : রবীন্দ্রনাথ' যাতে রয়েছে তাঁর সমাপ্তি মন্তব্য: 'সভ্যতার যেসব সংকট আজ, সেগুলো রবীন্দ্রনাথ খালি তাঁর স্বদেশ থেকেই দূর করতে চান নি, গোটা মানবতাকেই তিনি নিয়ে যেতে চেয়েছেন চিরসরলের রূপে সংস্থিত সত্যের সমীপে।' (ঐ)

ফ্রান্সের একজন খ্যাতনামা লেখক ফেলিসিয়্যাঁ শালে। কানের অতিথিশালায় তাঁর দর্শনলাভের সৌভাগ্য হয় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে। তার এক আবেগপূর্ণ বর্ণনা আমরা পাই তাঁর লেখায়। 'কী গাম্ভীর্যপূর্ণ রুচিস্নিগ্ধ ব্যক্তিত্ব, দীর্ঘ শ্মশ্রু আর কেশদাম, শুভ্রপ্রায়, কুঞ্চিত, তাম্রোজ্জ্বল মুখমণ্ডলের পূর্ণ সুসঙ্গতি; পক্ষ্মরাজির কেন্দ্র জোতির্ময় দুই নয়ন; গভীর আনন্দ আর ঐশ্বরিক প্রশান্তিমণ্ডিত আচার্যসুলভ উন্নত দেহ। সারাটা বিকেল কবিকে আমরা এতই কাছে পেলাম যে, তিনি শোনালেন কত না কবিতা, বাংলায় গাইলেন কত না গান।' (ঐ)

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অনেক বিশিষ্ট ফরাশি জনের সংক্ষিপ্ত যোগাযোগ ঘটেছে, তার কিছু দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করছি। পল ভালেরি খুবই প্রসিদ্ধ কবি ও বুদ্ধিজীবী। রবীন্দ্রনাথের প্রথম চিত্র-প্রদর্শনীর পূর্বে যে ক'জন চিত্র-রসিক ছবি দেখেন, তিনি তাঁদের অন্যতম। এই যোগাযোগের কর্ত্রী হলেন ভিক্তোরিয়া ওকাম্পো। রবীন্দ্রনাথের সচিব আরিয়ম এ সম্পর্কে লিখেছেন, 'মঁসিয়ে ভালেরির সঙ্গে কবির পরিচয় করিয়ে দিলেন মাদাম (৪ মে)। এই বিরাট ব্যক্তিত্বের সঙ্গে পরিচিত হয়ে দৃশ্যত অভিভূত হয়ে পড়লেন; গুরুদেব বলতে লাগলেন, ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থার কথা, মঁসিয়ে কান্-এর শিক্ষামূলক ছবি 'শান্তি ও যুদ্ধের কথা' – ১০ লক্ষ ভারতীয় সৈন্য ফ্রান্সের মাটিতে জীবন দিল তাদের কথার উল্লেখমাত্র নেই ছবিটিতে! ফ্রান্সের কাছ থেকে তিনি এতখানি নিষ্ঠুরতা আশা করেননি। ভালেরি নির্বাক বিস্ময়ে শুনে গেলেন।' (সমীর সেনগুপ্ত কর্তৃক উদ্ধৃত, পূর্বোক্ত)

বহু বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব বিভিন্ন পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎলাভ করেছেন, কিংবা তাঁর সম্পর্কে কিছু লিখেছেন। এঁদের মধ্যে আছেন অদেৎ আসলঁ, অঁদ্রে গ্রাঁব্রতিয়ের, মার্সেল মাতির্নে, জঁ রিশার ব্লক, জর্জ

দুয়ামেল, ফ্রঁসিস দিদলো, জর্জ ফ্রাদিয়ে, ফিলিপ স্তের্ন, আল্যাঁ দানিয়েল, শার্ল বুদোয়্যাঁ, দারিয়ুস মিলো (প্রখ্যাত সংগীতজ্ঞ, ইনি রবীন্দ্রনাথের একটি গান সুরারোপিত করেছিলেন)

অন্তত ছ'জন ফরাশি মহিলার সান্নিধ্য ও সহযোগিতা পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সংক্ষেপে তাঁদের কথা বলা যাক।

ফ্রান্সের সাংস্কৃতিক জগতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আলেকসঁদ্রা দাভিদ-নেল (Alexandra David Néel 1868-1969) প্রাচ্যবিদ ও সংস্কৃত-চর্চায় অধিকতর অভিজ্ঞতা অর্জনের নেশায় ভারতে আসেন ১৯১২ সালে। কলকাতার ঠাকুর পরিবার ও শান্তিনিকেতনের আশ্রম তাঁকে আকর্ষণ করে। রবীন্দ্রনাথের আসন্ন বিলাতযাত্রার প্রাক্কালে তিনি প্যারিসে কয়েকজন বিশিষ্ট সাহিত্যসেবীর কাছে কিছু পরিচয়পত্র দেন। সময় না থাকায় রবীন্দ্রনাথ তাঁদের কারু সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারেন নি। যাহোক, অনেক পরে তিব্বত ভ্রমণ শেষে আলেকসঁদ্রা কলকাতায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সে সময় স্পেন থেকে 'লা নাসিয়ন' ('La Nacion') পত্রিকায় কবির কাছে লেখা চাইলে তিনি এই মহিলার সঙ্গে যোগাযোগের কথা বলে দেন।

শ্রী অরবিন্দ আন্তর্জাতিক শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষয়িত্রী 'শ্রীময়ীরূপে' পরিচিতা বারবারা পিতোয়েফ মনে করেন, নাট্যকার রূপেও রবীন্দ্রনাথ 'মূলত কবি, প্রেরণা-দীপ্ত দ্রষ্টা'। তাছাড়া, 'সমস্ত অলংকার সব রকম আতিশয্য তিনি পরিহার করেছেন তাঁর নাটক থেকে। তাঁর নাটকের নিরাভরণ সাফল্য সম্পদ বলেই মনে হয় তাঁর সঙ্গীতের প্রাসাদে। সামান্য রঙ, সামান্য আলোকপাত দিয়েই তিনি এনে দিতে পারতেন কাম্য পরিবেশ, কাহিনীর বিভিন্ন পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য। ফলে, রবীন্দ্রনাথের যে লিরিক সৌন্দর্য, তা পেত যথার্থ অভিব্যক্তির স্বাধীনতা।' উল্লেখ্য

যে, ১৯১৯ সালে বারবারার পিতা জর্জ পিতোয়েফ জেনেভায় 'বিসর্জন' এবং ১৯৩৬ সালে প্যারিসে 'ডাকঘর' মঞ্চস্থ করেন। 'রবীন্দ্রনাথের ডাকঘর' প্রবন্ধে বারবারা এই নাটকটির আধ্যাত্মিকতা প্রসঙ্গে আলোকপাত করেছেন।

ফরাশি দু বোন – অঁদ্রে (Andrée Karpéles, 1885-1956) ও স্যুজান কার্পেলেস – রবীন্দ্রনাথ, রথীন্দ্রনাথ ও প্রতিমা দেবীর খুবই প্রিয়পাত্রী ছিলেন। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, 'কার্পেলেস-এর সহিত ঠাকুর পরিবারের ঘনিষ্ঠতা বহুকালের।' শান্তিনিকেতনে অঁদ্রে কলাভবনের অর্ন্তগত 'বিচিত্রা' নামক কারুসংঘ প্রতিষ্ঠা করেন। প্যারিসে এক পর্যায়ে কার্পেলেসদের সঙ্গে অবস্থানকালে প্রতিমা দেবী য়ুরোপীয় 'পটারির' কাজ শেখেন। বেশ কয়েক মাস সেবা প্রদান করে অঁদ্রে স্বদেশে চলে যান। শীতের সময় ফিরে আসবেন বলেছিলেন কিন্তু এলেন না। বিয়ে করলেন এক বিরাটকায় সুইডিশ যুবককে। রবীন্দ্রনাথ কৌতুকভরে চিঠি লিখলেন :

> '....I forgive your husband for wrenching you away from us with such a sudden jerk and I hope you understand what a degree of generosity that forgiveness of mine represent....'

রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে অঁদ্রের একটা ছোট কবিতা আছে :

> সীমাহীন তাঁর প্রতিভার মাঝে মিশে যায় এসে কত না শিল্প,
> বাণী দিয়ে তিনি চিত্র আঁকেন, খেলেন বর্ণ নিয়ে;
> ছন্দ যে তাঁর ছবির খোরাক, চিন্তাই তাঁর নৃত্য;
> ছত্রে ছত্রে দর্শন তাঁর, ভাবের তিনি যে ভাস্কর;
> গড়েন তিনি স্বপ্ন দিয়ে; শেখান নীরবতার মাঝে;

> রহস্যময়ী মৃত্যুর রূপ তাঁর হাতে পেয়ে অভিব্যক্তি
> মেলে ধরে তার অনুপলব্ধ সৌন্দর্যের মর্মলোক!

চিত্রশিল্পী অঁদ্রে সম্পর্কে সে সময়ে পত্রিকায় লেখা হয়েছিল – 'গ্রামে গ্রামে ঘুরে আমাদের দেশের কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে যে চারুশিল্পের প্রয়োজন রহিয়াছে তাহা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছেন। ইনি আশ্রমের শিল্পী শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু ও শ্রীমতি প্রতিমা দেবীর সহিত মিলিত হইয়া আমাদের দেশের কাঠের কারিগর, মাটির কারিগর ও গালার কারিগর লইয়া আধুনিক সময়োপযোগী করিয়া ভারতের পুরাতন ঐ সমস্ত নষ্ট শিল্পের পুনরুদ্ধার করিতেছেন। কাপড়ের উপর কাজ করা আমাদের দেশের একটি মূল্যবান সম্পদ – এই দিকেও শিল্পিদের লইয়া তাঁহারা অনেক উন্নতি বিধান করিয়াছেন।' ('আনন্দবাজার পত্রিকা', ১১ বৈশাখ, ১৩৩০)

স্যুজান ছিলেন অ্যাকাডেমিক প্রকৃতির। তিনি প্রাচ্যবন্ধু সমিতির সদস্য এবং একাধিক ফরাশি ইনস্টিটিউটের সঙ্গে জড়িত। একসময়ে তিনি রবীন্দ্রনাথের সচিবের দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর অভিজ্ঞতার শরণাপন্ন হলে আমরা কয়েকটি ঘটনার সাক্ষীরূপে তাঁকে পাব। সেটি রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় সফর। তিনি লিখেছেন: 'সকালবেলা রোজই আমার প্রথম কাজ ছিল সেই দিনের ডাক খুলে উল্লেখযোগ্য চিঠিগুলো কবিকে পড়ে শোনানো। এমনি একদিন ওঁকে শোনাবার সৌভাগ্য হল ফরাসীতে লেখা চমৎকার একটি চিঠি (ফরাসী উনি খুব ভালই বুঝতেন)..সাধারণত গুরুদেব ফরাসী চিঠিগুলো আমাকে দিয়েই লেখাতেন এবং নিচে কেবল সই করে দিতেন। কিন্তু এই চিঠিটা পড়ে তিনি বললেন, তিনি নিজেই এর জবাব লিখবেন যেহেতু লেখিকা নিজে ইংরেজি জানেন।' কিন্তু মজার ঘটনা ঘটে তার আগে। এক গ্রীষ্মের

সকালে সাঁলাজার স্টেশনে তিনি কবিকে নিয়ে স্যাঁ-ক্ল্যতে কানের বাড়িতে যাবার জন্যে একটি ট্যাক্সি নিলেন। গন্তব্যস্থলে পৌছে স্যুজান 'ভাড়া মেটাতে গেলে ট্যাক্সিওয়ালা তাঁর পকেট থেকে বের করলো উগ্র চরমপন্থী দলের বিখ্যাত 'দৈনিক ল্যুমানিতে'। প্রথম পৃষ্ঠাতেই রবীন্দ্রনাথের ছবি, বিভিন্ন রচনাবলী থেকে প্রচুর উদ্ধৃতি। আমার হাত ধরে ট্যাক্সিওয়ালা জানতে চাইলো ইনি সত্যিই 'উনি' কিনা। 'হ্যাঁ' – আমি ঘাড় নেড়ে জানালাম। 'আর তা সত্ত্বেও আমি ভাড়া নেব, আপনি কী ভেবেছেন?' ট্যাক্সিওয়ালা চেঁচিয়ে উঠলো।' কৌতূহলী রবীন্দ্রনাথ আমাদের দিকে এগিয়ে এলেন কী ব্যাপার জানার জন্য। সব কথাই আমি খুলে বললাম। উনি জানতে চাইলেন, কী কর্তব্য ? 'ফরাসি কায়দায় ওর সঙ্গে করমর্দন করা।' – আমি বলে দিলাম ইংরেজিতে। আর গুরুদেব তাঁর সুন্দর হাতখানি মেলে ধরেছেন কি ধরেননি – এমন সময় ট্যাক্সিওয়ালা খুব সাগ্রহে জড়িয়ে ধরলো হাতটি। পরম আনন্দে কবির হাতটা দোলাতে লাগলো যেন প্রভাতী ঘণ্টা বাজাচ্ছে লোকটা। অবিস্মরণীয় বিশ্বকবির সেই হাসি – পারির ট্যাক্সিচালকের আনন্দ।'

স্যুজান সুন্দর করে লিখেছেন তাঁদের স্বনামধন্য মহিলা কবি আনা দ্য নোয়াইর পরিদর্শনের কথা: 'অপূর্ব সুন্দরী তিনি, তেমনি রুচিপূর্ণ তাঁর বেশভূষা। মাথা ঘুরিয়ে দেবার মতো চেহারা তাঁর, আবালবৃদ্ধ সমস্ত পুরুষই প্রথম দর্শনে তাঁর প্রেমে পড়তো। হাবুডুবু খেত, লুটিয়ে পড়তো তাঁর পদতলে। সে জন্যেই বিজয়িনীর মতো এসেছিলেন তিনি নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত কবির কাছে, গোটা ভারতকে তাঁর অঙ্কশায়িত দেখবার স্বপ্নে মশগুল হয়ে। অবিস্মরণীয় এক নাটকীয় দৃশ্যের সাক্ষী রইলাম আমি। রবীন্দ্রনাথ যতই উর্দ্ধ থেকে উর্দ্ধতর রূপে, আনা দ্য নোয়াই-এর ততই রোখ চেপে যাচ্ছে তাঁকে বশে আনবার, কিন্তু ব্যর্থ

প্রয়াস। কয়েক মিনিট বাদে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, তাঁরা দুজনেই কবি এবং তাঁদের সাক্ষাতকারের এই তাৎপর্যটুকু বিস্মৃত হওয়া অন্যায়। তখন অত্যন্ত সাদা গলায় আনা দ্য নোয়াই রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করলেন স্বরচিত কিছু কবিতা শোনাতে; তারপর এল আনার স্বরচিত কবিতা পড়বার পালা' (পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত)

কোঁতেস আনা দ্য নোয়াই রবীন্দ্রনাথের চিত্রপ্রদর্শনীর ক্যাটালগের যে ভূমিকা রচনা করেছিলেন, তা নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। আমরা তার পাঁচটি অনুচ্ছেদ তুলে ধরলাম:

১. 'দশ বছর আগে আমার দুর্লভ সৌভাগ্য হয়েছিল, গ্রীষ্মের এক সন্ধ্যায়, সেই নদীর ধারের এক প্রাচ্য-সুলভ বাগানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে পায়চারি করবার। কবির উন্নত দীর্ঘ দেহ, সোনালী বালির ওপর তাঁর মৃদু পদক্ষেপ, নিয়তিকে বরণ করে নিয়ে নিজে হাতে তাকে গড়ে নেবার ক্ষমতায় দৃপ্ত এক দৃঢ়সঙ্কল্প নবীর মতো মুখশ্রী, সমস্ত মানবতাকে সমৃদ্ধ করতে সান্ত্বনা দিতে সক্ষম শান্তি-স্নিগ্ধ দুটি হাত, সব কিছুই সামঞ্জস্য এনে দিচ্ছিল বাগানের পথের দুধারে ফোটা অজস্র বাংলা দেশের গোলাপের সঙ্গে, জাগিয়ে তুলছিল তাদের নতুন এক তাৎপর্য।

কী মহান কী প্রাচুর্যধন্য এই মহামানব যাঁর প্রতিটি কথাই যেন স্বগতোক্তি, প্রতিটি কথাই রহস্যময় অথচ রুপোলি সমুদ্রের মতোই স্বচ্ছ।

২. 'এই কবি নিজেকে প্রচুর অবকাশ দিয়েছেন নিজেকে নিবিড় করে জানবার জন্যে। জ্ঞান তাঁর আসে হঠাৎ, তারপর জাগে তাঁর সন্দেহও, তেমনই আকস্মিক। এই যে যাদুকর যিনি নির্ভয়ে হাত তুলে দাঁড়াতে

পারেন আসন্ন ঝড়ের মুখোমুখি, যিনি অসহ্য মারাত্মক বৃশ্চিক দংশনের জ্বালা উপশম করতে জানেন নিছক ইচ্ছাশক্তির কল্যাণে, তাঁকেই দেখেছি কী সঙ্কুচিত আপন সৃষ্টির প্রসঙ্গে – এর সাক্ষী দিতে পারি আমরা সবাই। সবই যখন তাঁর প্রশংসা করে, সন্দিহান, দ্বিধান্বিত, উনি শুধু হাসেন।

৩. 'বিস্ময়কর এই সৃষ্টিগুলি, যা একাধারে চোখ জুড়োয় আর আমাদের টেনে নিয়ে চলে বহু দূরের সেই সব দেশে, যেখানে কাল্পনিক বস্তুই বাস্তবের চেয়ে বেশি করে বাস্তব – ভেবে চমৎকৃত হতে হয় কী করে যুক্তিবাদী স্বপ্নপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথ এই সৃষ্টির দ্বার খুলে দিলেন! বুনো পায়রার মতো রঙের কমনীয় যে হাতে তিনি কবিতা লিখতেন, সেই হাতই তাঁর পাণ্ডুলিপির মার্জিনে খুঁজে পেল হঠাৎ, অব্যক্তর আনন্দ সুরায় মাতাল হয়ে, ক্ষুরস্যধার রচনার বিধিনিষেধ থেকে অনেক-অনেক দূরের এক জগৎ যেখানে কল্পনার অদম্য শক্তিই সর্বেসর্বা। প্রথমে মোটামুটি কিছু স্কেচ এঁকে নিয়ে তিনি তারপর বসলেন অবচেতনার ঐশ্বর্যরাশিকে সমৃদ্ধতর নিটোলতর করে তুলতে, অলৌকিক পথ-প্রদর্শকের বাধ্য শিষ্যের মতো।..

৪. 'প্রথম দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের ছবিগুলো ঘুমের ঘোরে সূক্ষ্ম কোনো লোকে প্রবেশ করবার মতোই অস্পষ্ট স্বপ্নালু মনে হলেও অনবদ্য রচনাশৈলির কল্যাণে অনতিবিলম্বেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে; হতবাক হয়ে যেতে হয় এই প্রতিভাধরের অণোরনীয়ান মহতো মহীয়ান আত্ম-অভিব্যক্তির ছন্দ দেখে। ছায়ার পোঁচ, তুষারের শুভ্রতা, কত লাল, কত সবুজ, কত-না বেগুনির সমাবেশ, যা গড়ে তুলেছে জীবন্ত এক বিশ্ব। যে-রবীন্দ্রনাথের মনমাতানো গান আমাদের নিয়ে গিয়েছে সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর কত না প্রত্যয়ের লোকে, আজ তিনি আমাদের সামনে তুলে

ধরলেন মানবসাগরের সুমহান রহস্য, অসংখ্য পুরুষক্রমিক প্রভাবের রহস্য, যা কি-না লুটিয়ে পড়েছে অসুরের অট্টহাসিমুখর প্রেতগণের পদতলে!

৫. 'কেন মহান মিস্টিক রবীন্দ্রনাথ, প্রেমোন্মাদ কবি এমন আকস্মিকভাবে নিজেকে ধরে দিলেন অজানা সেই শক্তির কাছে, যে-শক্তি তাঁর মনের আড়ালে বসে বিদ্রুপে, ব্যঙ্গে, এমনকি ঘৃণায় পুষ্ট হয়ে উঠছিল? যতই যাই হোক, রবীন্দ্রনাথের আঁকা ছবির মধ্যে প্রধান ভূমিকা নিয়েছে রূপেরই সত্তা। কী মহানুভব মুখভঙ্গী, দৃপ্ত ভাব, নাগলোকের কমনীয়তা, আর গভীর নীল রাত্রি যেখানে শেক্সপীয়রের আঁকা সুখী প্রেমিক-প্রেয়সীরা কি-না আমাদের নিয়ে যায় মৃত্যুহীন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য-প্রায় এক স্বর্গের সুষমালোকে। কিন্তু সের্ভান্তেস-বর্ণিত চরিত্রগুলির মতো পার্শ্বচিত্রগুলিকেই বা আমার কী করে এড়িয়ে যাই? অস্বস্তি না অনুভব করে কী করে পারি অশিবগ্রস্ত মুখোসগুলোর সামনে – রোগা, লাল, পাণ্ডুর, বিশেষ এক কোণ থেকে যা দেখা দিয়েছে ছুরির ফলার মতো প্রখররূপে, ছলনা, খলতা, বিশ্বাসঘাতকতারই অবতার যেন এক-একটা? এগুলো পরেই, একজোড়া পায়রার ছবিতে যে নিপুন ভারসাম্য সৃষ্ট হয়েছে, দেখে মন আনন্দে নেচে ওঠে। আর হাওয়ার বুকে যেন থমকে-দাঁড়ানো সগর্ব সুন্দর হরিণটাকে দেখে কে না অভিভূত হবে?' (রবীন্দ্র অনূদিত)

মাদাম জান রানে দীর্ঘ পনেরো বছর ধরে য়ুরোপ আফ্রিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে কয়েকবারে পাঁচ বছর ছিলেন ভারতে। তাঁর মতে, 'রবীন্দ্রনাথের জীবন হলো সৌভ্রাতৃত্বের সুন্দরতম উদাহরণ' যিনি প্রতিভায় শেক্সপীয়র, টলস্টয়, য়্যাগো-র সঙ্গে তুলনীয়। মাদাম রানে প্যারিসে, হায়দ্রাবাদে ও ট্রেনে কবিকে কাছে পেয়েছিলেন। তাঁর

বক্তৃতায় শুনেছেন, 'পাশ্চাত্যে প্রগতি আর পূর্ণতার পার্থক্য সম্পর্কে লোকে প্রায় গণ্ডগোল করে ফেলে।' (১৯৩৩) তিনি আরো লিখেছেন, 'রবীন্দ্রনাথের চিত্রগুলি (যা ফ্রান্সে আদৃত হয়) বিচিত্র তাদের দ্যোতনার দিক দিয়ে। যুগের চেয়ে বহুলাংশে অগ্রসর ছিল। রহস্যময় কী এক উপস্থিতির ভাব প্রস্ফুট সেখানে'। (ঐ)

ফরাশি আকাদেমির আরেক সদস্য জঁ ককতো সমগ্র বিশ্বে কবি, কথাশিল্পী, নাট্যকার ও চলচ্চিত্রকার রূপে বিখ্যাত। ফ্রান্সে রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে যে শ্রদ্ধার্ঘ প্রকাশিত হয়, তার শুরুতে ককতোর একটি 'জের্ব', অর্থাৎ শীষ, আসলে শংসা-বচন জাতীয় রচনা প্রকাশিত হয়। এর একটি স্বচ্ছন্দ অনুবাদ উপস্থাপন করা হলো:

'কিছু কবির এই অধিকার রয়েছে যে তাঁরা কোথাও স্থিত নন, তাঁরা একরকম 'অন্য কেউ'। এ রকম ছিলেন তাগোর (রবীন্দ্রনাথ) এবং তিনি তাই থাকলেন, কারণ তিনি তুলনারহিত। জনগণ জানার চেয়ে চেনাকে অধিক পছন্দ করে। কিন্তু তাগোর জোরের সঙ্গে চান জীবিত থাকতে। এটা অন্য একটা অতি মহান এবং অতি সূক্ষ্ম বিষয় যা তাঁর মহিমা প্রচার করে এবং উনামুনো (Unamuno)-র কল্পিত 'নির্জনদের ন্যায়ের সংগ্রামের' (Croisade des Solitaires) শীর্ষস্থানে তাঁর আসন নির্ধারণ করে। মৃতদের বৃথা অনুকরণ করে যে-স্মৃতিসৌধ, আমি তাতে একটি পুষ্পস্তবক অর্পণ করলাম।'

উপসংহার

প্যারিসের অভিজ্ঞতায় রবীন্দ্রনাথ একদা লিখেছিলেন, 'এখানকার যেসব মনীষী বিশ্বমানবের সমস্যা বড় রকম করে চিন্তা করচেন তাঁদের অনেকের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। এঁদের সঙ্গে আলাপ হলে মন মুক্তি লাভ করে। কেননা মানুষের মুক্তিক্ষেত্র হচ্চে ভাবের ক্ষেত্র।' ('শান্তিনিকেতন পত্রিকা' ,আশ্বিন ১৩২৭পৃ.৩৫৮)

ভাষা ও অপরিচয়ের বাধাকে সবচেয়ে বড় ভেবে রবীন্দ্রনাথ শুধু ইংল্যান্ডে ও আমেরিকায় তাঁর ভ্রমণের পরিধি বাড়িয়ে চলেছিলেন। কিন্তু শেষ অবধি ফ্রান্স-এর সঙ্গে কিংবা প্যারিসে সুধী-সজ্জনের সঙ্গে তাঁর যথার্থ পরিচয় ঘটল ১৯২০ সালে সফরে এসে। পর পর আরো চার বার তিনি প্যারিসে আসেন। তখন তাঁর চিন্তাধারা আরো পরিবর্তিত হয়ে যায়। পূর্বাহ্নে অনুভব করলেও তিনি যথার্থভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে সমর্থ হলেন যা জনৈক য়ুরোপীয় সাহিত্যিক বলে প্রবচনে পরিণত করেছেন : 'তুতম আ দ্যো পাত্রি – লাসিয়ান এ পুই লা ফ্রঁস', অর্থাৎ মানুষ মাত্রেরই দুটি মাতৃভূমি– একটি তার নিজস্ব আর অন্যটি ফ্রান্স। এটি উদ্ধৃত করে 'অন্য স্বদেশ' শীর্ষক প্রবন্ধে ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন, 'ফ্রান্সের গৌরবময় ঐতিহ্যের পরিচয় লাভের সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছে তাঁরা সকলেই যে একথা সমর্থন করবেন, তাতে সন্দেহ নেই। ...সৌন্দর্যনিষ্ঠা এবং শিল্পানুরাগ ফরাসী চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য। স্বাধীনতা আর গণতন্ত্রের যে-আদর্শ এতদিন প্রাচীন গ্রিসে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল, আধুনিক ফ্রান্সও প্রবল অনুরাগে সেই একই আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করে তুলতে চেয়েছে। গণতান্ত্রিক জাতি মাত্রেই নাগরিক শুভবুদ্ধির পরিচয় দিয়ে

থাকেন; ফরাসী জীবনের সঙ্গেও এই শুভবুদ্ধি অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশ্রিত রয়েছে।' ('দেশ', ১৬ জুলাই ১৯৫৫)

রবীন্দ্রনাথের জীবন-সাধনা এই ভাবধারায় প্রবাহিত। বিশ্বে ক্রমবর্ধমান যান্ত্রিক সভ্যতার বিকাশ, ঔপনিবেশিক শক্তির মানবতাবিরোধী কদর্য ভূমিকা ও প্রথম মহাযুদ্ধের ধ্বংসলীলা রবীন্দ্রনাথকে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন করেছিল। ফরাশি সুধীবৃন্দ তাঁদের ভূখণ্ডে তাঁকে আন্তরিক অভ্যর্থনা জানিয়ে রবীন্দ্র-ভাবনার অংশীদার হতে এবং নিজেদের পরাজিত মনোভাবের ওপর বিজয়ের রশ্মি আলোকিত দেখতে চেয়েছেন। ফরাশি বুদ্ধিজীবী পিয়ের আমাদো লিখেছেন, 'একথাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, ফরাসি সংস্কৃতির জন্যে রবীন্দ্রনাথের যে-অনুরাগ, তা স্বতই ধ্বনিত হয়েছিল ১৯৪০ সালের জুন মাসে পারী পতনের সংবাদে বিচলিত হয়ে, মার্কিন রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টের কাছে কবির তারবার্তায়। তার আগের রাত্রেই, তিনি ফরাসি আকাশবাণীতে দৈবাৎ শোনেন, 'ডাকঘর'-এর ফরাসি প্রচার । স্বামী বিবেকানন্দের মতো রবীন্দ্রনাথও বুঝেছিলেন যে ফ্রান্স আর ভারতের লক্ষ্য হচ্ছে বিশ্বজননীকে প্রসূত করা, যা হলো উভয় দেশের সংস্কৃতিরই মূল সুর।' (পৃথ্বীন্দ্র মুখোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত)

মাতৃভূমির প্রতি অনুরাগ ও মানবিকতার জন্য মোহের কারণে রবীন্দ্রনাথের পক্ষে লেখা সম্ভব হয়েছিল:

'বাংলাদেশের চিত্ত সর্বকালে সর্বদেশে প্রসারিত হোক। বাংলাদেশের বাণী সর্বজাতি সর্বমানবের বাণী হোক।' (চিঠিপত্র ২য় খণ্ড)

এই মনোভাবের প্রতিধ্বনিই যেন তিনি পেয়েছিলেন ফরাশি মনীষী ও সাধারণ মানুষের আচরণে এবং তাঁদের সঙ্গে ভাব-বিনিময়ে।

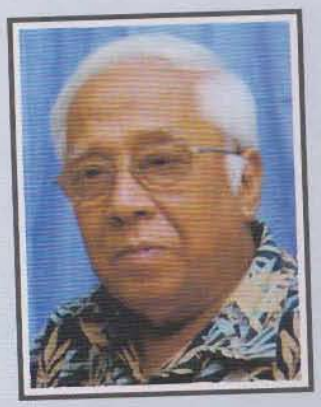

জন্ম ১৯৩৬ সালে, চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ায়। বাংলায় স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১৯৬৫ সালে সর্বন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চ সম্মানের সঙ্গে ডক্টরেট ডিগ্রি। ১৯৬৮ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে অধ্যাপনা। ১৯৭১ সালে যোগ দিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধে। ১৯৭৭ সালে যোগ দেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে। বাংলা একাডেমীর মহাপরিচালক ছিলেন। এখন আছেন সাভারস্থ গণ বিশ্ববিদ্যালয়ে।

ইউনেস্কো তাঁর বাউল গানের অনুবাদ প্রকাশ করেছে। প্যারিস থেকে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর গবেষণাগ্রন্থ : 'Etude sur Levoulution intellectuelle chez les Musulmans du Bengale : 1857-1947', ঢাকা থেকে প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলীর মধ্যে রয়েছে 'Culture and Development'; 'দার্শনিক দিদ্‌রো ও তাঁর সাহিত্যকীর্তি'; 'অঁদ্রে মালরো : শতাব্দীর কিংবদন্তী'; 'সিমন দ্য বোভোয়ার : জন্ম শতবর্ষের স্মৃতিসম্ভার'; 'সৈয়দ আলী আহসান ও বিশ্ব সংস্কৃতি'।

পেয়েছেন একুশে পদক। ফরাশি সরকার তাঁকে ভূষিত করেছেন চারটি পদক ও উপাধিতে। এগুলো হলো যথাক্রমে, Chevalier Dans Lordere Des Palmes Academiques', Officier Dans Lordre Des Palmes Academiques, Lordre Des Arts et Des Lettres, Au Grade D'officier' Legion D' honneur.

প্রচ্ছদশিল্পী : খন্দকার মুন্তাসির শামস, বয়স : ১০